বাংলাদেশের জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতি



প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা শীর্ষক ২য় কর্মশালার কার্যবিবরণী

১০-১১ই জুন, ১৯৮৭ ইং
২২-২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৪ বাং

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

৪।

বাংলাদেশের জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতি



কর্মসূচী ও পাঠ্যক্রম বিভাগ
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা।

বাংলাদেশের জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতি

১০ - ১১ই জুন, ১৯৮৭ ।

২২ - ২৩শে জৈষ্ঠ্য, ১৩৯৪ বাংলা তারিখে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভারে অনুষ্ঠিত বি সি এস শিক্ষা নবিস কর্মকর্তাদের কর্মজীবনে প্রবেশোত্তর প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সমুহের ভূমিকার উপর দ্বিতীয় কর্মশালার কার্যবিবরণী ।

কর্মসূচী ও পাঠ্যক্রম বিভাগ
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা ।

			পৃষ্ঠাঃ
১ ।	মুখবন্ধ	ঃ	
২ ।	কর্মশালার সুপারিশ সমূহ খসড়া ও জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতির প্রস্তাবিত সংশোধনী সমূহ ঃ	ঃ	১-১২
৩ ।	National Training Policy: A Conceptual Framework -ডঃ সৈয়দ গিয়াস উদ্দিন আহমেদ ।	:	১৩-৩৭
৪ ।	জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতির ধারণাগত কাঠামোর উপর আলোচনা ঃ	ঃ	৩৮-৫৭
৫ ।	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ উন্নয়নের কলাকৌশল ডঃ শেখ মাকসুদ আলী ।	ঃ	৫৮-৬৮
৬ ।	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ উন্নয়নের কলাকৌশল সম্পর্কিত আলোচনা ঃ	ঃ	৬৯-৮৬
৭ ।	জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতিমালা সম্পর্কে কিছু ভাবনা ও সুপারিশ - ব্রিগেডিয়ার(অবঃ)ডি এস ইউসুফ হায়দার ।	ঃ	৮৭-৯১
৮ ।	জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতিমালা সম্পর্কে আলোচনা ঃ	ঃ	৯২-১১৪
৯ ।	সমাপনী (৪র্থ) কর্মঅধিবেশনে সভাপতির বক্তব্য	ঃ	১১৫
১০।	অংশগ্রহণকারীদের তালিকা	ঃ	১১৬-১১৭
১১।	কর্মশালার কর্মসূচী	ঃ	১১৮-১২০

কর্মশালা উপদেষ্টাঃ ডঃ আকবর আলী খান
এম, ডি, এস (পিএন্ডএস)
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ
কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা।

কর্মশালা পরিচালকঃ জনাব অরবিন্দ কর,
পরিচালক (পিপিআর),
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ
কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা।

কর্মশালা সমন্বয়কঃ জনাব হাসান ইমাম
মূল্যায়ন কর্মকর্তা,
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ
কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা।

মুখ্য প্রতিবেদকঃ জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম ভুইয়া,
উপ পরিচালক (পিপিআর)।

প্রতিবেদকবৃন্দঃ ১) জনাব মোঃ মুনির হোসেন,
সহকারী পরিচালক (পিপিআর)।

২) জনাব আনওয়ার হোসেনখান,
মূল্যায়ন কর্মকর্তা।

৩) জনাব সুপদ কুমার ঘোষ,
মূল্যায়ন কর্মকর্তা।

৪) বেগম নাহিদা আমিন খান
রেক্টরের একান্ত সচিব।

প্রবন্ধ লেখক কর্মশালায় অংশগ্রহনকারী/
সভাপতিবৃন্দের বক্তব্য তাহাদের নিজস্ব
মতামত বলিয়া গন্য করিতে হইবে এবং
এই মতামত আবশ্যিকভাবে কেন্দ্রের মতামত
নহে।

'' মুখবন্ধ ''

সকল সরকারী নীতির মতই প্রশিক্ষণ নীতি ও প্রশিক্ষণ বিষয়ে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী সিদ্ধানুগ্রহনের নির্দেশিকা হিসাবে কাজ করবে, এ লক্ষেই জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতির খসড়া প্রণীত হয়েছে। প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বিরাজমান যে অব্যবস্হা ও সাময়িকতা রয়েছে তা দুরীকরণের জন্য এবং এর মধ্যে সুষ্ঠুতা আনয়নের জন্যই এ উদ্যোগ। সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চো ব্যবহার ও অপচয় রোধ করে সরকারী কর্মচারী / কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও সময়ের প্রয়োজনে তাঁদের মনোভাব পরিবর্তনের যে লক্ষ্য সরকারের রয়েছে তাও এ খসড়া প্রশিক্ষণ নীতিতে স্হান পেয়েছে। কিন্তু সকল নীতির মতই প্রশিক্ষণ নীতির প্রথামিক খসড়াও সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও যুক্তি যুক্ত হতে পারেনি। এই বোধ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সরকারী কর্মকর্তা, কর্মচারী, বুদ্ধিজীবী ও ব্যবহার-জীবী মহলে বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছিল। প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল এ খসড়া নীতিমালার উপর একটা খোলামেলা ও বিশদ আলোচনার। আর সে প্রয়োজনকে মনে রেখেই বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গত ১০ ও ১১ই জুন, ১৯৮৭-তে কেন্দ্রে দু'দিনের একটি কর্মশালার আয়োজন করেছিল।

জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতি যে তত্ত্বগত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। সেই সাথে আমরা অনুভব করেছিলাম যে, অভ্যন্তুরীণ প্রশিক্ষণের কলাকৌশলের উন্নয়ন সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা হওয়া দরকার। সেজন্যই এসব বিষয়াদি আলোচনা করার জন্য আমরা প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী ও ব্যবহরেজীবীগনকে আমাদের কর্মশালায় প্রবন্ধ/নিবন্ধ পাঠের জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলাম। সেই সাথে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রধান, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্হার কর্মকর্তাগনকেও আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলাম কর্মশালায় অংশগ্রহনের জন্য। আমাদের আমন্ত্রনে সাড়া দিয়ে ২২টি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ এই কর্মশালায় যোগদান করেন।

কর্মশালাটি ৫টি কর্ম অধিবেশনে বিভক্ত ছিল। প্রথম তিনটি কর্মঅধিবেশনে জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতির তাত্ত্বিক ধারনা', অভ্যন্তুরীণ প্রশিক্ষণ উন্নয়নের কলাকৌশল,'' জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতিমালা সম্পর্কে কিছু ভাবনা ও সুপারিশ '' এই শিরোনামে ৩টি পত্র পাঠ করেন যথাক্রমে ডঃ সৈয়দ গিয়াস উদ্দিন আহমেদ, ডঃ শেখ মাকসুদ আলী ও ব্রিগেডিয়ার(অবঃ) ডি এস ইউসুফ হায়দার। প্রতিটি অধিবেশনেই নির্ধারিত আমন্ত্রিত আলোচক ছাড়াও কর্মশালায় অংশগ্রহনকারীগণ আলোচনায় অংশগ্রহন ও বিভিন্ন দৃষ্টি কোন থেকে তাদের বক্তব্য উপস্হাপন করেন।

৪র্থ অধিবেশনে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতি সম্পর্কিত সুপারিশ প্রণয়ন করেন এবং খসড়া প্রশিক্ষণ নীতির সংশোধনী নির্দেশ করেন। ৫ম কর্ম অধিবেশনে সকল দলের উপস্থিতিতে একটি সর্বসম্মত সুপারিশমালা প্রণীত হয়।

কর্মশালাটি সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভাব বিনিময় ও সৌহার্দ্য সৃষ্টির একটি সুযোগ তৈরী করেছিল। সেইসাথে জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতির মত একটি গুরুত্বপুর্ন বিষয়ের উপর বিভিন্ন দৃষ্টি কোন থেকে আলোচনা সমালোচনা করারও একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। আর তারই ফসল হচ্ছে কর্মশালায় প্রণীত সুপারিশমালা ও খসড়া নীতির উপর নির্দেশিত সংশোধনী সমুহ। আমাদের ধারনা সুপারিশগুলো অত্যন্ত বাস্তবসম্মত, সুষ্ঠু, ও প্রয়োগ সম্ভব হয়েছে। এ গুলি জাতীয় প্রশিক্ষণ কাউন্সিলের সুবিবেচনা পাবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

এই কর্মশালার প্রবন্ধকার, অধিবেশন সভাপতি, আলোচক ও অংশগ্রহনকারীবৃন্দকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কর্মশালার উপদেষ্টা ডঃ আকবর আলী খান ও পরিচালক জনাব অরবিন্দ কর'কেও আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই কর্মশালার কার্যবিবরণী প্রকাশের ব্যাপারে যে সকল কর্মকর্তাবৃন্দ জড়িত ছিলেন তারাও একটি গুরুত্বপুর্ন কাজ সমাপনের জন্য আমাদের সকলের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এ ধরণের কর্মশালা ভবিষ্যতেও আয়োজন করার আশা রাখে। এ ব্যাপারে আমরা সর্ব মহলের সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করছি এবং এর উন্নয়নের জন্য সুপারিশ আহবান করছি।

এ,কে,এম, হেদায়েতুল হক
রেক্টর।

- ১ -

" সুপারিশ সমুহ "

(ক) প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ঃ

ক'১ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সমুহকে পূর্ণ ও কার্যকরী স্বায়ত্ব শাসন প্রদান ফলপ্রসু প্রশিক্ষণের পূর্বশর্ত হিসাবে বিবেচনা করা উচিত । সেই উদ্দেশ্যে নিম্ন বর্নিত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহন করা যাইতে পারে ঃ-

- প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সমুহের আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধি ,
- কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান সমুহকে ক্ষমতা প্রদান ,
- বিদেশে প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে মনোনয়ন চুড়ান্ত করণের ক্ষমতা প্রদান,
- ভৌত কাঠামো নির্মান, শিক্ষাপোকরণ যন্ত্রপাতি ক্রয় ও সংগ্রহের ক্ষমতা প্রদান,
- নিজস্ব যানবাহন ক্রয়, ব্যবহার ও মেরামতের ক্ষমতা প্রদান ,
- গবেষনা, ঘটনা সমীক্ষার জন্য বিশেষ আর্থিক বরাদ্দ প্রদান ,
- উপরোক্ত শর্তাবলী সুষ্ঠুভাবে কার্যকর করিবার জন্য প্রত্যেক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন পরিচালনা বোর্ড গঠন করা বাঞ্চনীয় ।

ক'২ জাতীয় প্রশিক্ষণ পরিষদ প্রশিক্ষণের নীতি নির্ধারণ ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সমুহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিবে , কিন্তু কোন অবস্থাতেই প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সমুহের স্বায়ত্বশাসনে হস্তক্ষেপ করা উচিত হইবে না । এই পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় প্রশিক্ষণ পরিষদের বর্তমান দায়িত্ব ও কর্তব্য পুনর্নির্ধারণ করা প্রয়োজন ।

ক'৩ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রেষণে কর্মকর্তা/প্রশিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের চাহিদা ও প্রশিক্ষকের পালনীয় দায়িত্ব ও কার্যাবলী বিবেচনায় আনা বাঞ্চনীয় এবং সেই অনুসারে কর্মকর্তা চয়ন করা প্রয়োজন ।

ক'৪ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সমুহে দক্ষ প্রশিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন । সেইসাথে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমুহে বিরাজমান ভৌত অবকাঠামো, প্রশিক্ষণ উপকরণ, যন্ত্রপাতি ও যানবাহনের অপ্রতুলতাও পূরণ করা দরকার ।

- ২ -

ক°৫ অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ও গবেষনা খাতে স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/ বিভাগের বাৎসরিক বাজেট ন্যূনতম ৭½ % ভাগ বরাদ্দ নিশ্চিত করা প্রয়োজন ।

(খ) প্রশিক্ষকদের উন্নয়ন ও উৎসাহ প্রদান ঃ

খ°১ অনুষদ উন্নয়নে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ একটি অনস্বীকার্য ও অপরিহার্য অংগ । কিন্তু বর্তমানে যে নীতি চালু রহিয়াছে তাহা অনুষদ উন্নয়নের পরিপন্থী । তাই বর্তমান বৈদেশিক প্রশিক্ষণ নীতির আমুল সংশোধনের প্রয়োজন রহিয়াছে । এই পরি-প্রেক্ষিতে নিম্নবর্নিত ব্যবস্থা গ্রহন করা যাইতে পারে ঃ-

(ক) শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষনা প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত অনুষদ ও কর্মকর্তাদের জন্য প্রয়োজন ভিত্তিক ভিন্ন ধরনের নীতিমালা প্রণয়ন করা বাঞ্চনীয় ।

(খ) এই নীতিতে এম,এস, প্রোগ্রামের জন্য কর্মকর্তাদের সর্ব্বোচ বয়স ৪০ বৎসর নির্ধারণ করা প্রয়োজন । পি,এইচ,ডি, প্রোগ্রামের জন্য সর্ব্বোচ বয়ষ ৪৫ বৎসর বৎসর হওয়া উচিত ।

(গ) অন্যান্য স্বল্প মেয়াদী ও মধ্যমেয়াদী প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বয়স কোন বাধা হিসাবে বিবেচনা করা উচিত হইবে না তবে প্রশিক্ষণ অবশ্যই প্রয়োজনভিত্তিক হইতে হইবে ।

(ঘ) বিশেষজ্ঞ হিসাবে কোন অনুষদ সদস্যকে কোন আন্তর্জাতিক সংস্হা বা দেশীয় সংস্হা আমন্ত্রণ জানাইলে তাহা সাধারনত অনুমোদিত হওয়া উচিত ।

(ঙ) বৈদেশিক প্রশিক্ষণ - যোগ বিতরণের ক্ষেত্রে প্রেষণে নিযুক্ত কর্মকর্তাদিগকে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কর্মকর্তাদের মত সমানভাবে বিবেচনা করিতে হইবে ।তবে প্রশিক্ষণ গ্রহনের পর একটি নির্দিষ্ট সময় তাহাদেরকে (প্রেষনে নিযুক্ত কর্মকর্তা) সেই প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত থাকিতে হইবে ।

খ°২ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ ক্যাডার সৃষ্টি করিতে হইবে ।

খ°৩ সুষ্ঠু প্রশিক্ষণ পরিবেশ তৈরীর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে যোগ্য প্রশিক্ষকবৃন্দকে আকৃষ্ট করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্হা গ্রহন করা প্রয়োজন । এই উদ্দেশ্যে নিম্নরুপ ব্যবস্হা গ্রহন করা যাইতে পারে ঃ

(ক) উৎসাহ ভাতা ব্যাপারে জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতিমালায় যে সকল ব্যবস্হাদির কথা বর্নিত হইয়াছে তাহার জন্য বিধি প্রণয়ন করিয়া অবিলম্বে তাহা বাস্তবায়ন করিতে হইবে ।

(খ) প্রশিক্ষণ ভাতা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সকল প্রশিক্ষকবৃন্দকে সমভাবে প্রদান করিতে হইবে। শুধুমাত্র প্রেষণে নিযুক্ত প্রশিক্ষককেই ভাতা প্রদান সুষ্ঠু প্রশিক্ষণ পরিবেশের পরিপন্থী। কাঠামোগত কারনে কিছু কিছু প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে মাত্র সরকারী বিভিন্ন ক্যাডারের কর্মকর্তাবৃন্দ প্রেষণে নিযুক্ত হন কিন্তু অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে স্ব স্ব বিভাগের কর্মকর্তাকে সরাসরি নিয়োগ করা হয় কিন্তু তাহারা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে নিযুক্তির ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ ভাতা পান না। তাই সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মকর্তাবৃন্দ (প্রেষণে নিয়োজিত ও সরাসরি ক্যাডার হইতে নিয়োজিত) একই হারে প্রশিক্ষণ ভাতা দেওয়া প্রয়োজন। তাহা ছাড়া সমতা রক্ষার প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কর্মকর্তাগণকেও সমহারে ভাতা প্রদান করা প্রয়োজন।

(গ) প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে আকৃষ্ট করিবার জন্য উচ্চতর ডিগ্রীধারী কর্মকর্তাবৃন্দকে ডিগ্রী অনুযায়ী অতিরিক্ত ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(ঘ) প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট সময়কাল অতিবাহিত করিবার পর কর্মকর্তাদের পরবর্তী নিয়োগের ক্ষেত্রে তাঁহাদের পছন্দ বিবেচনা করিতে হইবে। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের কর্মকাল পদোন্নতির ব্যাপারে বিশেষ বিবেচনায় আনিতে হইবে।

(গ) প্রশিক্ষণার্থীদের উৎসাহ প্রদান ঃ

গ·১ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের গুরুত্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর জ্যেষ্ঠতা নিরুপনের অন্যতম নির্ধারক হওয়া উচিত।

গ·২ প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দকে প্রশিক্ষণে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য তাহাদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

(ঘ) পাঠক্রম ও গবেষনা উন্নয়ন ঃ

ঘ·১ প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা ও মানবৃদ্ধির লক্ষ্যে অনুসরণ পদ্ধতি জোরদার করা প্রয়োজন।

ঘঃ২ বিভিন্ন সংস্থার প্রশিক্ষণ চাহিদা সুষ্ঠভাবে নির্ণয় করিতে হইবে এবং প্রশিক্ষণের রুপরেখা চাহিদা ভিত্তিক হইবে।

ঘ·৩ প্রশিক্ষণ কোর্স, প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীর মূল্যায়নের উপযুক্ত পদ্ধতি ও মানদন্ড নির্ণয় করা প্রয়োজন । কোন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কর্মকান্ড মূল্যায়ন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত কমিটি কর্তৃক সম্পন্ন হওয়া বাঞ্চনীয় ।

ঘ·৪ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অধীনে সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সমুহকে বাৎসরিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী তৈরী করিতে হইবে । প্রত্যেক মন্ত্রণালয় ও বিভাগকেও বাৎসরিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করিতে হইবে ।

ঘ·৫ প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণে কেবল দালানকোঠা নির্মানের উপর জোর না দিয়া পাঠক্রম উন্নয়ন, ম্যানুয়েল তৈরী ইত্যাদি বিষয়ে আনুপাতিকহারে ব্যয় বৃদ্ধি করা যাইতে পারে । বর্তমানে প্রচলিত প্রতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত অপ্রতুল । যেহেতু প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ও প্রশিক্ষণের চাহিদা বিপুল এবং বর্তমানের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে সেই চাহিদা মিটানো সম্ভব নয় সেইজন্য আমাদেরকে বিকল্প ব্যবস্থার কথা চিন্তা করিতে হইবে ।

তাহার রুপরেখা নিম্নরুপ হইতে পারে ঃ-

- জৈষ্ঠ্য কর্মকর্তা/দপ্তর/মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে সংযুক্তি ,
- ক্যাশ প্রোগ্রামের ভিত্তিতে ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষক দল পাঠিয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ,
- টেলিভিশন সহ দুর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহন ,
- কর্মস্থলে হাতে কলমে প্রশিক্ষণকে জোরদার করণ ।

(ঙ) অন্যান্য ঃ

ঙ·১ প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞানকে কার্যে প্রয়োগ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সুনির্দিষ্ট নীতি থাকা প্রয়োজন । প্রশিক্ষণ নীতি , নিয়োগ নীতি ও কর্মজীবন উন্নয়নের মধ্যে উপযুক্ত সমন্বয় আনয়ন করিতে হইবে ।

ঙ·২ সরকারী কর্মকর্তা নিয়োগের ব্যাপারে সরকারী কর্মকমিশনের(পি এস সি) একটি সুনির্দিষ্ট সময়সূচী থাকা প্রয়োজন যেন সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে সময়মত প্রবেশোত্তর প্রশিক্ষণ (পোষ্ট এন্ট্রি) দিতে পারে ।

৬.৩ দেশের সার্বিক উন্নয়নে নিয়োজিত এন জি ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মকান্ড সংশ্লিষ্ট সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির প্রশিক্ষণ কর্মকান্ডের সাথে সমন্বয়ের প্রয়োজন। এই জন্য এন, জি, ও, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকারী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির সম্পুরক হিসাবে কাজ করিবার সুযোগ সৃষ্টি করা উচিত। এই লক্ষ্যে উভয় প্রকার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দ্বিমুখী ভাব-বিনিময়ের প্রয়োজন।

৬.৪ বিদেশী প্রশিক্ষক/বিশেষজ্ঞদের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বাংলাদেশী নাগরিকদের একটি বিষয়ভিত্তিক তালিকা প্রণয়ন করা একান্ত প্রয়োজন। বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে তাহাদের প্রশিক্ষণের বিষয় অনুযায়ী নিয়োগ করা হইয়াছে কি না তাহা মূল্যায়ন করিতে হইবে।

৬.৫ প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ শেষে কর্মজীবনে প্রতিনিয়ত প্রয়োজনীয় আইন বিষয়ক বই পুস্তক প্রদান করিতে হইবে।

৬.৬ জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডে গতি সঞ্চারের জন্য নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং প্রশাসকদের যৌথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত।

৬.৭ প্রশাসনিক কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা উচিত।।

(চ) খসড়া জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতিমালার সংশোধনী ঃ

খসড়া জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতিমালা চূড়ান্ত করণের ব্যাপারে নিম্নবর্ণিত সংশোধনী ও মতামত বিবেচনা করা যাইতে পারে ঃ

১। জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতির খসড়াটি বাংলায় লিখিত হওয়া উচিত এবং খসড়াটি " জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতি হিসাবে গ্রহন করা যাইতে পারে ।

২। আন্তঃ মন্ত্রণালয় কমিটি ও সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মতামত নিয়া জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতির সার্বিক রূপ দেওয়া উচিত ।

অধ্যায়ঃ মুখবন্ধ ।

১। খসড়া নীতিমালার অনুচ্ছেদ ১.০৬-তে বর্ণিত প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগের সার্বিক প্রশিক্ষণ নীতি প্রণয়ন যুক্তিযুক্ত নয় । এই ক্ষেত্রে বাৎসরিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী প্রণয়ন করা যাইতে পারে ।

অধ্যায়ঃ সূচনা ।

১। অনুচ্ছেদ ২.০১-তে বর্ণিত " The BPATC envisages integration of faculty staff programme and facilities " বাক্যটি বাদ দেওয়া যাইতে পারে । সমন্বয় সাধিত হইয়াছে, ইহার প্রয়োজন নাই । এই অনুচ্ছেদের সর্বশেষ বাক্যে " All levels in service training " কথাটি পরিস্কার নয় । ইহা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা প্রয়োজন ।

২। সকল ক্যাডারের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ বিপিএটিসিতে হওয়া উচিত । ' ব্যাক লগের ' জন্য বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়া যাইতে পারে ।

৩। পদোন্নতি বিষয়ে অনুচ্ছেদ ২.০৪ বাদ দেওয়া যাইতে পারে ।

- ৭ -

৪। ক) ক্যারিয়ার ডেভলপমেন্ট কোর্স এ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর প্রশিক্ষণ ফলাফলের উপর ভিত্তি করে পদোন্নতি/ বিদেশে প্রশিক্ষণ সুযোগ দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

খ) প্রশিক্ষণের ফলাফল ' এ সি আর এ ' অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

৫। অনুচ্ছেদ ২.০৯ঃ তৃতীয় বাক্যটিতে বলা হইয়াছে যে, বিভাগীয় অথবা পদোন্নতি পরীক্ষার মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, বাক্যটি সুস্পষ্ট অর্থ বহন করে না এবং তাহা সংশোধিত হওয়া উচিত।

অধ্যায়-২ঃ লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পরিধি।

১। এই অধ্যায়ের শুরুতে পাঁচ বৎসরের জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতির কথাটি উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই। প্রশিক্ষণ নীতির উদ্দেশ্য সমুহ কথাটি লিখে তাহার আওতায় ১, ২, ৩ করে উদ্দেশ্য লিখিতে হইবে। উদ্দেশ্যের ' সি ' টি বাদ দেওয়া যাইতে পারে। উদ্দেশ্যের আওতায় ' ডি ' তে উল্লেখিত Apex training Centre কথাটির পরিবর্তে Centre of excellence ব্যবহার করা যাইতে পারে।

২। অনুচ্ছেদ ৩.০৫ এ উল্লেখিত Apex training Centre নির্ধারনের বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা/ মাপকাঠি দেওয়া হয় নাই। বিষয়টি স্পষ্টতর করা প্রয়োজন।

৩। অনুচ্ছে ৩.০৬ এ Apex training Institution গুলির ক্ষেত্রে self-financing trend সৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে। বিষয়টির বাস্তবায়ন সম্ভব নহে। সেইজন্য বাক্যটি বাদ দেওয়া যাইতে পারে।

অধ্যায়-৩ঃ পর্যালোচনা।

১। অনুচ্ছেদ-৩ পর্যালোচনা পর্যাপ্ত নয়। এর একটি রুপ রেখা দরকার। ইহাতে একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানের ফলাফল তুলিয়া ধরা হইয়াছে।

২। অনুচ্ছেদ ৪.০৫ঃ প্রশিক্ষণ ক্ষমতা যথাযথ ব্যবহারের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/ বিভাগকে আরো সচেতন হইতে হইবে এবং তাহাদের পক্ষ হইতে ইহাতে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করিতে হইবে।

৩। Result of review and monitoring এর ফলাফলের ব্যাপারে আরো বিস্তারিত ও পর্যাপ্ত তথ্য প্রয়োজন।

৪। অনুচ্ছেদ ৪.০৭ঃ পূর্বে অনুচ্ছেদের বক্তব্যের আলোকে দুইটি পুনঃনিরীক্ষা করা প্রয়োজন।

অধ্যায়ঃ ৪- জনশক্তি, প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা সেক্টর ঃ

১। ৪র্থ অধ্যায় পরিসংখ্যান গুলির পুনরায় যাচাইয়ের প্রয়োজনীতা রহিয়াছে।

অধ্যায় -৫ঃ প্রশিক্ষণ কলাকৌশল ঃ

১। অনুচ্ছেদ ৬.০১ এ বর্নিত পরিসংখ্যান সমুহ পুনঃ পরীক্ষা করিয়া দেখা প্রয়োজন।

২। ক) অনুচ্ছে ৬.০৩-এ বর্নিত (বিদেশে প্রশিক্ষণ) প্রকল্প আওতাভুক্ত বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যাপারে সাহায্য দাতা দেশের সহিত চক্তি স্বাক্ষরের সময় প্রকল্পের চাহিদা বিবেচনায় নেওয়া উচিত।

খ) কোন কোন ক্ষেত্রে বৈদেশিক প্রশিক্ষণের বিষয়াবলী দাতা সংস্থা নির্ধারণ করে থাকে, তবুও সেগুলি নিরুৎসাহিত করা সঠিক হইবে না।

গ) প্রশিক্ষণে শুধু ক্ষমতা বৃদ্ধি হয় না। প্রশিক্ষণে দৃষ্টি ভংগির পরিবর্তন হয়। বিদেশ সফর দৃষ্টি ভংগির পরিবর্তনের জন্য সহায়ক এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নাই। কাজেই বৈদেশিক বৃত্তিকে নিরুৎসাহিত করা লাভ জনক হইবে না।

ঘ) ১৭.৩৩ জন মাস যদি ব্যয়িত হইয়া থাকে তবে তাহা সমগ্র দেশের কর্মকর্তা/ কর্মচারী অনুপাতে মোটেই বেশী নয়। জন মাসের হিসাব হয়ত সঠিক নহে।

(ঙ) সরকারী কর্মচারীদের ভাল কাজ করার জন্য কোন পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা নাই। অনুদানে প্রাপ্ত বৈদেশিক বৃত্তি সরকারী কর্মচারীদের উৎসাহিত করার জন্যেও ব্যবহার করা যাইতে পারে।

৩। অনুচ্ছেদ নং- ৬.০৬ এর সহিত অত্রদল একমত নয়। তবে শুধু মাত্র বেকার যুবকদের কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সরকারের সহায়তা করা উচিত।

৪। অনুচ্ছেদ ৬'০৭ বলা হইয়াছে যে , বিশ্ববিদ্যালয় সমুহ স্নাতোকোত্তর ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠান হইলে বৈদেশিক বৃত্তির চাহিদা কমিবে । ইহা ঠিক নহে । টাকা ব্যয় করিলেই রাতারাতি উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা যাইবে না । এই কাজে অনেক সময় লাগিবে । কাজেই বৈদেশিক বৃত্তি হ্রাস করার চাইতে প্রাপ্ত বৈদেশিক বৃত্তি কি ভাবে ব্যবহার করা যায় তাহার উপর জোর দেওয়া বাঞ্চনীয় হইবে । এই অনচ্ছেদে ভুল তথ্যও পরিবেশন করা হইয়াছে । ইনষ্টিটিউট অব চার্টাড একাউনটেন্ট কোন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত হয় নাই ।

৫। অনুচ্ছেদ ৬'১০ বর্ণিত প্রজেক্ট টাইড প্রশিক্ষণ অনুমোদনের জন্য এন,টি,সি'তে পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া মনে হয় না । এই ব্যাপারে ই আর ডি'র অনুমোদনই যথেষ্ট । এন টি সি'তে শুধু মাত্র মনিটরিং এর জন্য তথ্যাদি পাঠানো যাইতে পারে ।

৬। অনুচ্ছেদ নং- ৬ঃ১১ ও ৬ঃ১২ নীতিমালার প্রসংগিক নয় বলিয়া বাদ দেওয়া যাইতে পারে ।

অধ্যায় - ৬ঃ বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ঃ

১। স্মারক নং- ইডি/(এফ টি)/৩৯/৮৩-৩১২(১০০)/ তারিখ- ১৩-৬-১৯৮৩ এ যে সকল নীতিমালা নির্ধারণ করা হইয়াছে তাহা মোটেও যুক্তি যুক্ত না হওয়ায় সামগ্রিকভাবে এই নীতিমালা পরিবর্তন করা দরকার । এই বিষয়ে প্রশিক্ষক উন্নয়ন ও উৎসাহ প্রদান উপশিরোনামায় সুপারিশ বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে ।

অধ্যায় -৭ঃ প্রশিক্ষণে মুল্যায়ন ও মনিটরিং ঃ

১। অনুচ্ছেদ ৮'০৩ বর্ণিত প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ সম্পর্কে যে প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহা এই মুহুর্তে কার্যকরী করা সম্ভব নয় । বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র একটি নুতন প্রতিষ্ঠান এবং এরুপ একটি নুতন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এ উদ্যোগ নেওয়া বর্তমানে সম্ভব হইবে না । উপরন্তু প্রস্তাবিত পাঁচ দিনের কোর্সে কোন ফল হইবে কি- না তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে ।

২। অনুচ্ছেদ ৮.০৪ বর্নিত যে মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহা এন টি সি কর্তৃক অনুমোদিত পদ্ধতি হইতে ভিন্ন। এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুমোদন করিবার পুর্বে বিষয়টি পুনঃ পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

৩। অনুচ্ছেদ ৮.০৫ অপ্রয়োজনীয় এবং অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। তবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক উপযুক্ত কর্মকর্তা/ কমিটির মাধ্যমে উক্ত মনিটরিং করা যাইতে পারে।

অধ্যায়-৮ঃ প্রশিক্ষণের উৎসাহ।

১। অনুচ্ছেদ ৯.০১ প্রশিক্ষণ ভাতা সকল প্রকার প্রশিক্ষণার্থীদিগকে প্রদান করা উচিত।

২। অনুচ্ছেদ ৯.০২ সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য নহে। এই অনুচ্ছেদে বর্নিত শর্তটি বাস্তবধর্মী হওয়া প্রয়োজন।

৩। অনুচ্ছেদ ৯.০৩ বর্নিত মতামত যথার্থ ভাবে বর্তমানে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সমুহের দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা সম্ভবপর নয়।

৪। অনুচ্ছেদে ৯.০৪ বর্নিত প্রশিক্ষণ ভাতার সহিত পরামর্শ ও অন্যান্য ভাতা প্রদান করা উচিত।

অধ্যায়ঃ ৯ - প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপন।

১। অনুচ্ছেদ ১০.২ শেষের তিন লাইন নুতনভাবে সাজাইয়া লিখিতে হইবে। কারণ একমাত্র বিপিএটিসি ছাড়া অন্য প্রতিষ্ঠানে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় না।

২। অনুচ্ছেদে ১০.০৫ দ্বিতীয় লাইনে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান লিখিতে হইবে। শেষের দুইটি বাক্য নুতন ভাবে সাজাইয়া লিখিতে হইবে।

৩। অনুচ্ছেদ ১০.০৫ শতকরা ৪০ ভাগ প্রশিক্ষণ সুবিধা অব্যবহৃত থাকা এবং বিদেশে প্রশিক্ষণ ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করিয়াছে এই বক্তব্যের উপর অতিরিক্ত নির্ভরতার সংজ্ঞা দেওয়া হয় নাই।

৪। অনুচ্ছেদ ১০.০৬ তৃতীয় বাক্য উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য এবং প্রশিক্ষকদের বেলায় বিদেশে প্রশিক্ষণের সুযোগ উন্মুক্ত রাখিতে হইবে এবং এই জন্য বিদেশী সাহায্য পাওয়া গেলে তার সদ্ব্যবহার করিতে হইবে।

অধ্যায় ১০- উপজেলা কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ।

১। অনুচ্ছে ১১.০৩ প্রথম লাইন 'নেভার' এর জায়গায় লিখিতে হইবে 'সঠিকভাবে কাজে লাগানো হয় নি'।

২। অনুচ্ছেদ ১১.০৭ বলা হইয়াছে যে, উপজেলাতে প্রশিক্ষণের জন্য 'প্রচুর' অর্থ বিনিয়োগের প্রয়োজন রহিয়াছে। কি উপাত্তের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে তাহা উল্লেখ করা হয় নাই। এই প্রশিক্ষণের জন্য বৈদেশিক সাহায্যের আদৌ প্রয়োজন আছে কিনা : তাহা পরীক্ষা করিবার অবকাশ রহিয়াছে। উপজেলা উন্নয়নের জন্য সরকারের বরাদ্দকৃত অর্থের শতকরা ২ ভাগ প্রশিক্ষণের খাতে আলাদা করিয়া রাখিতে হইবে।

অধ্যায় ১১ঃ বাস্তবায়ন ও মনিটরিং ব্যবস্থা।

১। অনুচ্ছেদ ১২.০২ ইহাতে বলা হইয়াছে যে, প্রশিক্ষণ ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার না হওয়ায় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের বাজেট বরাদ্দ হ্রাস করা হইবে। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা ব্যবহার না হওয়ার জন্য দায়ী হইতেছে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়। প্রথমতঃ যথা-সময়ে নিয়োগ না হইলে প্রশিক্ষণার্থী পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ কর্মকর্তা/কর্মচারীর অভাব রহিয়াছে এই অজুহাতে প্রশিক্ষণার্থী পাঠানো হয় না। উপরন্তু অনেক ক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রশিক্ষক নাই। বাজেট হ্রাসের প্রশ্ন উঠে না, বরং বাজেট বরাদ্দ অনেক ক্ষেত্রে বাড়ানো প্রয়োজন।

(সি) বক্তব্য অস্পষ্ট।

(এফ) বেসরকারী খাতে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্লিয়ারেন্স নেয়া বাধ্যতামূলক করার প্রয়োজন নাই।

(জে) আধুনিক প্রশিক্ষণ সহায়কের উপরে অতিরিক্ত জোর দেওয়া হইয়াছে। কোন ধরনের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি কোন ক্ষেত্রে উপযুক্ত তা নির্ণয় করার ক্ষমতা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া উচিত। শেষ বাক্যে এন টি সি ও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের তদারকির বিষয় বাদ দিতে হইবে।

- ১২ -

(কে) এই বক্তব্য বাস্তবায়নের জন্যে প্রশিক্ষকদের বিদেশে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে ।

(এম) এই ধরনের মনিটরিং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের স্বায়ত্বশাসনের সাথে অসংগতি পূর্ণ বেসরকারী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের উপর জাতীয় প্রশিক্ষণ কাউন্সিলের কোন আইনগত এখতিয়ার নাই । ইহার জন্য আইনগত কাঠামো দরকার ।

অধ্যায় ১২ঃ উপসংহার ।

১। পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণকে অন্যতম পূর্ব শর্ত বলিয়া গন্য করিতে হইবে । প্রশিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য পদক্ষেপ গ্রহন করিতে হইবে । এই জন্য ট্রেনিং রিজার্ভ সৃষ্টি ও সঠিক প্রশিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করিতে হইবে ।

BPATC/PPA-640.
Date.07.06.87.

NATIONAL TRAINING POLICY: A CONCEPTUAL FRAMEWORK

Syed Giasuddin Ahmed

Indeed the existence of a national training policy is a pre-condition for effective training in the civil services of both developed and developing countries. When training activities in the civil service of a country are performed in an ad-hoc manner, without the guidance of a sound policy framework, inefficient use of human resources and duplication and/or overlapping of efforts are bound to occur. The training needs of different categories of civil servants and different agencies of government in developing countries in particular are numerous and varied. It is therefore very important that the objectives of training and guidelines for planning, directing and monitoring this important personnel activity be laid down by the government as part of an integrated policy.

This paper is especially designed to probe various aspects of planning training programmes at national level for the civil service in a developing country like Bangladesh. The main objective is to postulate a national policy framework for training the civil servants. This will be a prescriptive framework incorporating recommendations culled from the relevant literature as well as lessons drawn from recent developments in this area of personnel administration. The framework will serve as the normative standard against which assessment of training policies of Bangladesh will be made in the concluding section of this paper.

Before commencing the discussion of the main subject-matter, it seems in order to include a "terminological note" designed to pinpoint certain general notions as well as to furnish an explanation of such main expressions as "civil service", "training", "pre-entry training", and "in-service training" used in this paper.

TERMINOLOGICAL NOTE

Civil Service

The term "civil service" generally designates the whole body of civil employees of the public authorities in a country. Subject to certain

reservations, it is widely used in the English sense of the term, or that of the Spanish Sercio Civil. The English also uses the term "public service", a broader concept, but likewise roughly equivalent of the French term "fonction publique". In this paper the term "civil service" is used throughout as covering the expressions used in English, French and Spanish vocabularies. No account is taken of the exact nuance of the term in individual countries.

More specifically, the term "civil service" is used here to include the whole body of the national government personnel belonging to various occupational groups. Generally speaking, a civil servant (not being the holder of a political or judicial office) is paid wholly and directly out of money voted by the national legislature and works in a civil capacity in a government department and/or in a deconcentrated administrative unit of the national government both at sub-national and local levels of a country. The civil servants are responsible for the conduct of the whole range of government activities as they relate to the community. Their work extends from the formulation of policy proposals to the management of the machinery of government and carrying out the day-to-day duties that public administration demands.[1]

Training

The aims of training are too varied to compress into a concise definition. There is a tendency to define training in terms of teaching of instruction. It is looked upon as instruction in an art, a profession, or an occupation, consisting of teaching, drill or discipline by which powers of mind or body are developed. Training certainly is teaching with clearly defined objectives, but it is also learning. Unless something has been learned as well as taught, there is no learning.[2]

With particular reference to the civil service, training is the reciprocal process of teaching an learning a body of knowledge and the related methods of work. It is an activity in which a relatively small group of persons, acting as instructors, impart to the larger mass of civil servants knowledge which is believed to be useful in the work of the

latter. The instructors assist at the same time the larger body of civil servants to perfect skills which are useful in their work. In brief, training imparts knowledge and develops skills.[3]

There have been some efforts to define and discuss education and training in mutually exclusive terms. Education is usually employed to denote the kind of instruction which a young person may obtain in the schools and universities, while training is used to denote specialized instruction such as is offered in vocational schools/institutes. Viewed from intrinsic senses of the terms, education is defined as preparation for life, not for mere earning a living, while training is understood to have always a vocational purpose. With particular reference to employment in the civil service, education is understood to be the general cultural preparation which a young person receives before entering public employment, while training is understood to be the specific preparation received just before entering public employment or at a later point in the career and directed towards the performance of duties assigned to the individual.[4]

Pre-Entry Training

The term "pre-entry training" is commonly used to designate instrucrion received by the individual before the original appointment as a civil servant. Specifically, this interpretation of the term takes the date of entry upon salary status as the point of reference, and all preparation which precedes this entry is known as pre-entry training. Thus, pre-entry training ordinarily includes all the general education received in the schools or the universities, as well as special or technical education qualifying the individual to be employed by a government in such capacity as engineer, health officer, or agricultural officer.[5]

A more meaningful point of reference in defining pre-entry training is the date of entry upon regular duties. The students in the French National School of Administration, and in numerous similar schools in countries formerly under French rule, are salaried civil servants or carefully selected probationers who receive stipends while attending the schools, but the instruction given in these schools is essentially

pre-entry in nature. The students do not enter upon the duty at the managerial level until they successfully complete the entire counse.[6]

In-Service Training

In-service training of public employees may be distinguished from their pre-entry preparation by reference to two exclusive criteria: first, the time at which the training is given; and, second, the nature or content of the instruction. Niether of these criteria is precise or capable of being applied in a wholly objective manner. While the dividing point in time is usually marked by the change in status resulting from recruitment into the civil service, the new employee is often treated as something less than a full-fledged civil servant. His status during an extended period may be that of an apprentice, probationer, or intern. During this trial period, he may be required to continue his preparation to assume the duties intended for him. Such training may be imparted by informal guidance on the job, or the recruit may be required to attend classes in a training institution. If the instruction is of such a nature as to be generally regarded as necessary for entry into a profession or an occupation, it may be regarded as part of the pre-entry preparation. If the instruction is intended to supplement the basic knowledge or to perfect the skills needed in public employment, it may be regarded part of in-service training, usually called induction training. Instruction received later in the career, intended to impart new knowledge or to develop additional skills, may easily be recognised as in-service training.[7]

Nevertheless, it is not easy, nor is it necessary, to make a sharp distinction between pre-entry and in-service training. In effect, not infrequently one type of training tends to merge into the other almost imperceptibly. The broad objective remains the same, in-service training is particularly designed to prepare a well-rounded civil servant, capable of performing the tasks assigned to him and of growing to meet new responsibilities.

INGREDIENTS OF A TRAINING POLICY

The Assheton Committee, reporting on the training in the British civil service in 1944, said that training schemes should be comprehensively planned.[8] In fact this was the first known assertion of the principle in the sphere of planning for training. It has strongly influenced thinking in the field in subsequent years. Among the prestige agencies which reiterated the belief that training programmes should be planned may be mentioned the presently defunct U.S. Civil Service Commission. In 1960, this Commission called for "orderly planning for training programs",[9] because the Commission thought that training was not getting the attention it deserved.

The United Nations Handbook of Training in the Public Service, published in 1966, listed as many as 14 steps and measures which were considered to constitute a heuristic schema towards the formulation and implementation of an integrated training policy in a country. These 14 steps and measures are as follows:

- A comprehensive survey of human resources in the country.
- A nation-wide assessment of training needs in the civil service.
- An examination of existing training institutions both in public and private sectors.
- A study of the existing educational system and the courses offered in schools/colleges/universities.
- Consideration of available resources.
- Statement of assumptions.
- Statement of basic policy.
- Enumeration of the training to be offered.
- Formulation of goals and target dates.
- Consideration of implementation of programmes.
- Distribution of responsibilities for offering courses.
- Training staff needs.
- Material and other incidental needs.
- Budget allocations.[10]

It is true that the foregoing steps/measures towards an integrated training policy are both comprehensive and wide-ranging. They seem as well to draw an analogy with the steps and measures which contribute towards a national economic planning in a developing country like Bangladesh.

It is not that the sequence of the steps/measures listed above should be followed intact in making a national training policy in all the countries. As stated earlier, the steps/measures were intended to constitute basically a heuristic schema. It is likely that a schema as such is to be adopted in a country after taking into consideration certain related phenomena, such as pre-existing institutional systems and contemporary pressures for innovation, prevailing societal modes and traditions, socio-economic policy premises of the governing regime, and various elements of formal governmental structure, especially the juridical basic of government and civil service and the size of the civil service.[11]

The central idea of the heuristic schema is that a national training policy for the civil service should state the objectives and scope of all training activities, approaches to training needs assessment, the priorities and financing arrangements, the roles and functions of different categories of training institutions and mechanisms for coordinating their work, linkage of training to career planning and development, and guidelines for the monitoring and evaluation of training. Training policies must be based on a careful assessment of future national tasks and manpower requirements. Publicly declared training policies help employees understand the development opportunities available to them. For those who manage training in government, such policies provide a framework within which to plan their programmes seek resources, and guide and evaluate performances.

On the other hand, policy guidelines should not be so rigid and detailed that adaptation to changing circumstances become difficult. More detailed discussions of the key ingredients of a good national training policy follow.

Scope and Objectives of Training

By far the most important responsibility of a government is to declare publicly the broad objectives and scope of civil service training and the importance it attaches to this personnel function. This is to ensure that government's expectations are made clear to both the employees to be trained and those who perform training tasks. It is for the government to relate its objectives for civil service training with the national goals and environment of the country. Though specific objectives of the training might vary, most governments expect training to lead to improved and more efficient civil service through the development of appropriate skills, knowledge, and abilities among their personnel. The nature and scope of training may also be duly delineated through a policy announcement. For example, a government may assign considerable importance to in-service training and much less to pre-entry training. It may support in-service training through its own institutions and assign only a limited role to self-development of personnel through non-government institutions.[12]

Assessment of Training Needs

Identification of training needs is essential at three such levels as national, institutional, and individual training programme. An important function of policy formulation is to offer guidelines on the systematic assessment of training needs and assignment of responsibilities of this task among concerned agencies at all the three levels so that orderly planning of training activities of facilitated.

A broad assessment of training needs from a national perspective must be undertaken periodically to ensure that training institutions can be assigned appropriate training tasks and made to adapt to the changing requirements of the nation. A national assessment must take into account both the maintenance and development needs of the government. The strategies and priorities of development programmes, training needs perceived by the different agencies, and diagnosis of prevailing administrative inadequacies are among the sources of inputs for such a national exercise.

Given the nature of this assessment, the central personnel agency concefned with training, or other appropriate national agencies, should be assigned the responsibilities for this task.

Assessment of training needs at the institutional programme level must be undertaken within the framework of priorities generated by the national-level assessment exercise. Once each training institution is assigned an area of training responsibility, a more detailed exercise in identifying the needs must be undertaken by its professional training staff. A variety of methodologies and techniques of analysis of needs are available from which institutions must choose an appropriate mix. Among those methods are contextual analysis which relates needs to the gaps in specific administrative deficiencies, consultation with client organizations, feedback from former trainers, systematic field surveys of training needs, experimental programme as a learning device, and the critical incident technique. The choice of methods clearly cannot be done through a policy directive. Training policy, however, must identify the key agencies or institutions most appropriate to perform this important function and assign specific roles and responsibilities so that an integrated view of training needs emerges.[13]

Training Plans, Strategies, and Priorities

A policy decision must then be taken on the overall training plan for the government in light of the results of the exercise on assessing training needs. The training plan as such must embody within itself its underlying strategies and fix priorities in terms of the tasks to be accomplished. Training needs generally exceed the resources available. Hence it might become imperative to decide what will and will not go into a plan as such. This decision implies the choice of a mix of training programmes that best suits the national needs. This is a strategic decision which must be influenced by what resources - human, financial, and organizational - are available both in the short run and the long run. Policy guidelines indicating government's priorities and resources are essential to assist institutions in making their choices. Policy decisions

on annual-term and long-term training plans must be based on a repetitive process of interaction among individual institutions, and the central policy and coordinating agencies. Here again, while no policy can lay down the content of a training plan, the roles and responsibilities of different agencies in this task and the criteria and processes they must adopt are matters for policy decision. Policy guidelines for financing different types of training, for example, will indicate to both training agencies and civil servants the extent of financial support they can expect for training.[14]

Monitoring and Evaluation of Training

True though it is that in most least developing countries (LDCs) like Bangladesh training institutions are established and training activities are identified, governments in many an LDC do not perform their rightful role in monitoring and evaluating training. Both senior and junior training staff are so preoccupied with the design of curricula and the mechanics of training that insitutionalization of monitoring and evaluation tends to remain a weak area. There are both quantitative and qualitative dimensions to evaluation. First of all, when resources are allocated to approved training programmes, mechanisms must be established for the periodic monitoring of the inputs and outputs of these activities. They need to be aggregated at the national level and their trends and performance evaluated. Second, qualitative evaluation of individual training programmes and institutions must be encouraged. This is a more complex task and requires the creation of institutional review mechanisms - the working of which are monitored by a central agency. There are several methods of evaluation and different levels at which evaluation must be done. From a national point of view, the most important concern is the impact of training on organizational performance. Policy guidelines must specify (a) the criteria and periodicity of monitoring and evaluation, and (b) the roles and responsibilities of different agencies and institutions in this task. Policy review of a continuous nature can be attempted only when the monitoring function is strong.[15]

Career Development Linkages to Training

An important reason for the neglect of the evaluation function in training in most LDCs is the absence of suitable linkages between the broader personnel policies of government and training. The remedy to rectify this dysfunction lies in integrating training policy with the relevant aspects of the personnel policies of the government. The key areas for this purpose are career development planning and promotion. There is no denying the fact that training effectiveness is significantly influenced by whether the career development and promotion prospects of civil servants are affected by training. If training contributes to their career progress and their training performance is considered a formal criterion in evaluating them in the service, their incentive to use training will perforce be greater. Policy guidelines specifying the links between these elements are the most effective means to inform civil servants on how their career progress will be influenced by training. Relating training to different stages in a person's career, feeding inputs from training into his performance evaluation, and taking training into account in promotion decisions are aspects on which guidelines must be established. The administrative mechanisms for coordinating the implementation of these guidelines must also be stated in the policy.[16]

It follows from the foregoing discussion that a comprehensive training policy must contain suitable guidelines on different dimensions relevant to training. One would expect that operational decisions on training must be taken within the framework of such guidelines identified and discussed above.

Nevertheless, since a country's development needs and tasks change over time, there should also be a provision in the training policy for its periodic review and redesign whenever they become necessary. Indeed a good training policy is dynamic in nature and it embodies within itself the mechanisms for such review and redesign.

ORGANIZATIONAL ARRANGEMENT

An early publication on training published in 1941 stressed that "training is recognized to be a function of management".[17] This statement is to be understood as an assertion that the highest executives in a government have an inescapable responsibility for training. The reason for this is that the chief executive officers, and the entire managerial staff down to and including the first-line supervisors, have the responsibility for getting the work of the organization done efficiently. Under modern conditions, the attainment of the broad objectives of government requires that each civil servant shall be trained in the efficient performance of his task. It follows that management has the ultimate responsibility for training, because it constitutes an essential part of the administrative process. In other words, almost all members of the managerial group participate directly or indirectly in training operations.[18]

Be that it may, the formulation of basic policy relating to training, the fixing of overall responsibility of providing it, and the establishment of training institutions in a democratic state usually come under consideration from time to time in the national parliament/congres, or other legislative bodies. This is the case when pertinent articles and sections of the laws governing the civil services are under consideration. Many laws of this class contain passages which state the general policy and distribute the responsibility with respect to training civil employees. It is therefore, likely that the political executives such as ministers and heads of departments get involved in deliberations on these fundamental matters and it is that policy support from them which matters much in formulating basic training policies. Their acceptance of the desirability and necessity of training policies is essential to success.

The United Nations Seminar on Public Personnel Management, held from October 1950 to January 1951, expressed the opinion that main responsibility for training should be shared between the central personnel agency and the line departments.[19] This opinion has been reaffirmed on numerous later occasions and has in fact been applied in practice in

projects in which the UN gave assistance. This has become the generally accepted model for the organization of training function.[20]

In brief, there are at least three basic ideas of organizational arrangement for training. First, the assignment of the major responsibilities in training to specific parts of the administrative structure does not relieve management from its responsibility to seeing to it that a good training programme is planned and executed. Some authorities have looked upon this as a delegation of operating responsibilities by management, and in some countries it seems to be what has happened functionally. More commonly, however, the major responsibility in training are assigned to specific administrative agencies by law, executive decree, or other essential legislative action. Secondly, this organizational plan is based upon the belief that a large portion of the responsibility should be vested in a central agency, which shall be either the central personnel agency or an office closely related to it. This belief, however, leaves a choice among three qualifying agencies, namely, the Ministry of Finance or the Treasury, because of its great authority in personnel matters in some countries (particularly in England until 1968); the Civil Service Commission or Public Service Board (as in Australia); and the Central Personnel Office (as in Bangladesh, Pakistan and India). Thirdly, this organizational plan assumes that a large part of the operational responsibilities in training belongs to the ministries, departments, and other principal agencies of the executive branch of government. This indeed involves a division of responsibilities and in turn creates operational problems.[21]

Central Personnel Office

Although two main patterns of organization for training function have been identified other than the central personnel office, namely, the ministry of finance/treasury and the civil service commission/ public service board, the scope of responsibility of these two types of organization has increasingly been limited by transfering of responsibility for training to the central executive agency in the hierarchy in which the government-wide responsibility in personnel matters is vested.

This agency may be referred to as the Central Personnel Office (CPO) and it resembles the Establishment Division in Pakistan, the Ministry of Establishment in Bangladesh, the Department of Personnel and Administrative Reforms in India, and the Public Services Department in Malaysia.[22]

There seems to be no reason to enter into a detailed discussion in this paper of the location of general responsibility in personnel matters. The Central Personnel Office or the CPO is mentioned here only for the purpose of pointing out that training is usually treated as part of personnel administration and as one of the principal responsibilities of the CPO. It is this agency which usually has main responsibility for planning, organizing, and executing the programme of training.[23]

Advisory Committees/ Councils

A number of countries (including Bangladesh) also have created government-wide advisory committees or councils on training. The composition of these committees/councils vary greatly from one country to another, although they generally allow for fepresentation of all, or a wide selection, of the ministries or departments. In some cases, outside institutions/bodies like universities and associations of civil servants are represented. The Head of the CPO is usually included either as chairman or secretary.

In some instances, these advisory committees/councils are merely advisory in character and assist the CPO in surveying training needs and deciding upon broad questions of policy and programme. In other cases, the committees/councils have supervisory functions and carry out a periodic review of all training activities and prescribe changes as they may desire. In some countries, these committees/councils also function as coordinating bodies for training aspects of programmes of technical assistance. This means that they have the final authority to select civil servants for scholarships to travel and study abroad.[24]

ANALOGY WITH NATIONAL ECONOMIC PLAN

A passing reference to national plans of economic development seems appropriate at this stage with a view to drawing an analogy between such plans and the national training policy. The kind of planning which attracts the most attention is the preparation of national plans of economic development. The methods and techniques of national economic planning have become highly sophisticated. It is perhaps possible that certain important lessons may be drawn from the experiences of such national plans of economic development for application to training policies in the civil service.

The whole process of economic planning is ordinarily divided into two parts: first, the preparation of the plan; and, second, the adoption or approval of the plan by a higher authority. In countries committed to economic planning, an organization (such as the Planning Commission in Bangladesh) is created to perform the tremendous amount of research and other work involved in preparing the plan. This organization usually consists of two parts: first, a secretariat or working staff for the performance of research, the preparation of drafts, and other similar work; and, second, a planning board or panel of membership, having a general supervisory control over the planning operation.

In planning training policies in the civil services, the functions of the secretariat fall naturally to the head of the CPO and his professionally trained senior aides and other subordinates both in the training unit in the CPO and in the ministries and departments. These aides and subordinates are the men who are best equipped to undertake the staff work of planning for training. The function of the review panel may best be served by the advisory committees/councils on training which are part of the machinery provided in some countries. The desire to introduce serious attention to planning in the field of training would seem to be a good reason to set up a broadly representative advisory committee/council.

In national economic planning, it has become customary to state the broad goals of the plan as a desired rate of annual expansion in the economy.[25] This suggests the adoption, if possible, of a measurable goal in training in the civil service. Such a goal might be expressed as a percentage of the total civil service, or major classes of it, to be trained at specific target dates of the future.

An agency responsible for national economic planning has the need of a great mass of information, much of it in the form of statistical data. In like manner, a great deal of information is needed as the basis for intelligent planning in training.[26]

INFORMATIONAL BASIS

Perhaps the first need of the training officers in the CPO beginning the task of preparing a national training policy is a copy of the national development plan. They need to understand the broad goals and targets of the national plan, particularly with respect to the proposed use of human resources. A well-constructed national plan will tell the training officers whether they should calculate training needs in terms of the present strength of the civil service or anticipate a constantly expanding civil service. A United Nations Committee declared sometime in the early 1960s that "any sound project in the field of education and training has to be set in the context of the country's development program".[27] It is imperative therefore that the training plan be in accord with the national development plan.

In the event that no such national economic plan exists in the country, the training officers in that case should attempt to make the training plan in accord, as far as possible, with the known long-range intentions of the government.

The training officers, in their capacity as planners, should seek information as to whetehr the government has any intention of launching a new welfare or other social programme which would require changes in the composition of the civil service. The initiation of a new public service, often requiring the creation of a new administrative agency,

may impose emergency demands for training that are difficult to meet. planning means anticipating changed conditions and making preparation for meeting them.

A sound training policy should be formulated in accord with the best possible calculations of future trends in manpower resources. To appraise and analyze the human resources require studies of great delicacy. The manpower shortages of a particular period call for attention to the necessity, first , of collecting meaningful data on the resources of manpower available at or about that time ; and, second, of preparing plans to correct the deficiencies in human resources by education and training. These processes constitute the concept of the manpower survey, which means a general study of the human resources of a country and an attempt to predict future trends in the size and composition of the employable human resources.

The staff in the training unit of the CPO should have as much information as can be collected concerning the needs for training in the civil service. This task includes full knowledge concerning training activities in progress or completed in the recent past. It also involves looking into the future and preparing both short-terms and long - term estimates of training to meet the anticipated needs. The collection of these data involves the conduct of a survey of government-wide training needs.

The training officers should also be fully informed concerning the educational system of the country, including estimates of the system's capacity to produce persons having the occupational specialties required in the civil service. This indeed requires a careful study of the educational infrastructure, " because professional and vocational training must be associated with the general educational preparation of recruits in the public service "[28]. The training programme of the government should be designed to complement and continue the national educational programme of the country.

Just as the training officers need to be fully informed concerning the educational system of the country, so also they need to be informed concerning the existing training facilities. They must have at hand all tthe available information concerning the staffing and capabilities of training institutions. They need as well to know their resources of instructional material, reference library, and training aids and equipment. In effect, they need an intimate knowledge of how efficiently these institutions function and the capacities of their classrooms and other facilities. It is only with full information of these kinds that the training staff can consider intelligently the provisions which need to be made in the future.

It is well known that the statistical data available on the civil service systems of most countries have much research value. These are the data which would be most useful to the staff engaged in forecasting future training activities. Exports who have served in a technical assistance programme know that it is often impossible or extremely difficult to obtain a figure representing the total strength of the civil service. It is often possible to collect data on the number of positions authorized in the national budget. But such data of the national budget often prove unreliable because many of the authorized positions shown in the budget are not filled or extra employees of contingent categories may be engaged under some kind of a supplementary budget. An estimate of the total number of civil servants is of no great value for planning purposes. The training officers actually need to have a breakdown of the figures in many different categories, such as sex, age, educational attainments, and general level of responsibilities. In brief, the training staff need to have extensive and exact knowledge concerning the composition of the civil service.

Among the desirable statistical data, a matter of great importnace in the planning of training is the turnover rate. This means the proportion of public employees who leave the service for whatever reason during a year and have to be replaced. In some developed countries, the turnover rate is extraordinarily high. The volume of work thus presented to the training staff, just to give a brief orientation to all new and replaced recruits, may be overwhelming. A high turnover rate is, therefore, likely to commit the entire training staff to labour of both staggering

and continuous nature. In any case, the turnover rate, be it high or low, is a factor of great importance to be taken into account in planning for training.

The training officers engaged in planning need to have sound information concerning the results which may be expected from training. They need such information in order to guard against unwarranted expectations of quick and easy results from training courses. They need to be informed, not only on the possibleties of training, but also upon its limitations.

In order to plan effectively, the training officers need to have an extensive found of knowledge in their own professional specialty. They need to be well-informed concerning the kinds of training and the methods of instruction which have been used successfully in other countries. In brief, the training officers must be the men of high professional standing, fully conversant with the general principles of planning function in the field of training. Commensurate with their professional standing and qualifications, it is also necessary that due promotional and other incentive measures be proviced for to retain them in their professional field.[29]

CONCLUDING OVSERVATIONS:

The discussions in the preceding sections are part of a heuristic design purporting to postulate a conceptual framework for a national training policy. Hopefully, the various such sections as terminological note, identification of the basic ingredients, organizational arrangement and informational basis in the paper have succeeded in highlighting the important features that contribute towards the formulation and implemention of a national training policy in a developing country like Bangladesh.

It seems now appropriate in this concluding section to assess what Bangladesh has actually done so far in formulating a comprehensive training policy for the nation in light of the main conceptual features identified and discussed in the foregoing sections.

It may seem that in Bangladesh today there is no dearth of institutional facility for imparting training to civil servants belonging to different functional areas of the government machinery. In fact, most of the existing training institutions originated at different times before liberation in 1970.[30] But the official planners of the country made an observation while preparing the second five year plan (1980-85) that the training network in public/development administration was deficient both in quantity and quality. Most programmes in the area of administrative training had since liberation been pursued in a rather uncoordinated manner and almost independent of a comprehensive, coherent career development plan. Moreover, no systematic effort was made even a decade after liberation to formulate a national training policy and to review and measure the effectiveness of whatever training imparted to civil servants so far.[31]

Presumably, much of the deficiency in the sphere of training stemmed from the uncertainty that has since liberation been prevailing in the state policy, especially in respect of devising a new service structure. In the absence of a firm basis in the national civil service structure and a comprehensive/coherent career development plan, all training activities of the government seem to have been haphazard, piece-meal, and anachronistic. Most training programmes organized for a long time after liberation at such public administration training institutions as civil Officers' Training Academy, National Institute of Public Administration, Bangladesh Administrative Staff College, and Staff Training Institute, including many other institutions, lacked a central overview to assess the overall training needs, appropriateness of the use of the training materials and techniques, and the training effectiveness.[32]

However, it was only beginning in late 1980 that the government began giving greater attention to the training function. Certain administrative measures were made in or about the early 1980s with a view to streamlining the training activities in the civil service as a whole and at various training institutions in the country. In fact, the introduction of a new service structure in September 1980 paved the way for these measures to take place.[33]

In January 1981, the government at long last constituted a broad-based national body called the National Training Council (NTC), consisting of twenty members, with the Establishment Minister as Chairman and the Additional Secretary in charge of the Training and Career Planning Wing in the Establishment Division as Member-Secretary.[34] In May next year, the NTC was reconstituted with as many as 29 memberd drawing representatives from a wide selection of agencies and bodies in the country. The main functions of the NTC were to (i) formulate comprehensive training policy, coordinate training programmes of the various training institutions under different ministries/divisions, and evaluate the progress and effectiveness of such training programmes at the national level; (ii) fix priorities for the development of training facilities and allocate resources accordingly; and (iii) determine the relationship of training and education with public administration and development processes in the country.[35]

Subsequently in December 1983, the government thought it expedient to constitute a small and handy committee called Executive Committee of the NTC consisting of 12 members with such functions as to (i) dispose of all matters that require immediate disposal by the NTC; (ii) examine all issues before placement in the NTC meetings; and (iii) discharge any other functions as to be directed by the NTC.[36]

Prior to the formation of the NTC and its Executive Committee, the government took another administrative measure by setting up a separate administrative unit called Training and Career Planning Wing in the Establishment Division, headed by an Additional Secretary, to initiate coordinate, supervise, and assess the training policies and programmes at the national level.[37]

True though it is that the NTC and its Executive Committee were constituted almost a decade after liberation preceded by the creation of a separete wing called Training and Career Planning Wing in the Establishment Division (later renamed Ministry of Establishment) to ensure a central view in training-function of the government, it was only less than a year ago that a national training policy in draft form was finally formulated and presented to the NTC.[38]

It is true as well that the NTC has since its inception been deliberating on its assigned function. It met frequently to discuss as to how accomplish such a difficult task. Necessary ad-hoc committees and sub-committees were duly formed with representatives drawn from various ministries/divisions and training institutions to do such ground-work as collection of relevant data, collate the data so callected, identify and assess training needs, project training schedules, and so on. The work no doubt called for both professional ingenuity and inter-agency cooperation.[39]

It seems that the Ministry of Establishment accomplished the task single-handedly. The draft plan consists of as many as 183 printed pages. Although the front page of the draft carries the main title as National Training Policy, in several references inside the draft it has been classified as a five year national training plan of the country.

Part I of the draft, consisting of 29 pages, describes such subjects as introduction of the plan; aim,& objectives and scope of training; review and monitoring of training; manpower planning; training strategies; assessment of training needs; guidelines for assessment of training needs, nominations for training, and utilization of training. Part I of the draft follows by individual training schedules extending for five years of all the ministries/divisions and their attached departments and subordinate offices.

As claimed by the spokesman of the Ministry of Establishment, the draft training plan happens to be the first of its kind that has been presented after so much of "consistent effort, heard work and devotion" of the concerned officials and staff in the Ministry. Of course, there seems to be some truth in the claim. The draft is the first comprehensive document outlining the training policy for the nation. Indeed, the Ministry of Establishment, in general, and those who have directly accomplished the task, in particular, deserve to be congratualated.

To be sure, this concluding section is not going to undertake a detailed examination of the national training policy drafted by the Ministry of Establishment. In effect, this is not part of the main purposes of the paper. Nevertheless, it seems in order to make a few observations on the draft plan in light of the comments made by the Bangladesh Public Administration Training Centre itself.

Although the draft plan apparently contains features similar to what have been identified and discussed in the preceding sections of this paper, it suffers from a number of inherent inconsistencies. First, it is not clear whether the draft is a training plan in general or it is a five year national training plan. Its title says one thing, whereas the contents of the draft say the other. As pointed out by the BPATC, this confusion need to be cleared up forthwith.

Second, there are reasons to belief that such as important national training policy has been formulated single-handedly by the Ministry of Establishment. This should not have been the way of doing in such an important personnel matter. Since the draft is meant a national training policy, involving all ministries/divisions, training institutions, and many other both government and non-government organizations, it is an essential pre-condition that representatives from a wide selection of organizations should have been involved in its formulation processes. It is not understood why such a major and important training institution like the BPATC was not involved in such processes. Third, it seems that the Ministry of Establishment lacks professional expertise in formulating the plan. In the existing services structure there exists no provisions for this training profession to grow. The long-felt need for a training cadre is yet to be met. Moreover, the Training and Career Planning Wing, established in or about 1980, was abolished a year or so ago on the recommendation of a martial law committee formed in 1982. This abolition reflects how less serious the government is in attaching due importance to its training function.

In the final analysis, a national training policy is the sine qua non for effective training in the civil service in a developing country like Bangladesh. But a policy of such a national stature cannot grow in a vacuum. The first and foremost priority to undertake this important task calls for providing adequate measures towards the development of professionalism in the field. It then follows by a central overview, inter-agency cooperation, involvement of experts from sectors outside the civil service, and the firm commitment of those who consitutute the top political and administrative leadership in the country.

NOTES:

1. Syed Giasuddin Ahmed, Public Personnel Administration in Bangladesh Dhaka, University of Dhaka, 1986, PP. 13-14.
2. Se United Nations, Handbook of Training in the Public Service, New York, 1966, pp. 14-15.
3. Ibid., pp. 15-16.
4. See C. Glenn Stahl, Public Personnel Administration, New York, Harper & Row, 1976, pp 225-230; Felix A. Nigro, and Lloyd G. Negro, The New Public Personnel Administration, Itasca, Illinois, E.E. Peacock, 1976, pp. 227-231.
5. UN, Handbook of Training, op,cit.pp. 16-17.
6. Ibid.
7. Ibid., pp. 56-57.
8. Report of the Committee on the Training of Civil Servants, Cmd.6525, London, HMSO, 1944, p. 6.
9. U.S. Civil Service Commission, Employee Training for Better Public Service, May 1960, pp. 36-37.
10. See UN, Handbook of Training, op.cit. p. 193.
11. S.G. Ahmed, Public Personnel Management: A Model Organisational Schema", International Review of Administrative Science, Vol. 50, No. 4, 1984, p. 289.
12. Samuel Paul, Training for Public Administration and Management in Developing Countries, Washington, D.C., The World Bank, 1983, p. 30
13. Ibid., pp. 31-32.
14. Ibid., pp. 32-33.
15. Ibid.
16. Ibid.
17. Civil Service Assembly, Employee Training in the Public Service, Chicago, 1941, p. 4.
18. See Lynton K. Caldwell, Improving the Public Service Through Training Washington, D.C., AID, 1962, PP. 18-20.
19. UN, Report on the United Nations Seminar on Public Personnel Management, 30 October 1950 to 30 January 1951 (ST/TAA/CONF.1/1 31 January 1952), PP. 157-158.
20. UN, Handbook of Training, op.cit., p.118.
21. Ibid., pp. 118-119.
22. S.G. Ahmed, Public Personnel Administration in Bangladesh, pp.cit. p. 15.

23. UN, The Central Organs of the Civil Service in the Developing Countries, New York, 1969, pp.156-173.

24. UN, Handbook of Training , op.cit.p.121.

25. UN, Planning for Economic Development (Sales No. 64.II.B.3), 1964, p.28.

26. UN, Handbook of Training, op.cit., p. 194.

27. Un, Administrative Committee on Coordination, "Report of the Sub-Committee on Education and Training "(Coordination/R.398/Rev.1. 4 May 1962, p. 21.

28. See German Foundation for Developing Countries , Public Administration, Centre, Training Centres for Administrative Staff in Developing Countries, Berlin, 1964.

29. UN, Handbook of Training, op.cit., pp. 199-201.

30. See S.G. Ahmed, Public Personnel Administration in Bangladesh, op.cit., p. 254.

31. See The Second Five Year Plan, pp. xviii-45.

32. S.G. Ahmed, Public Personnel Administration in Bangladesh, op.cit.p.255

33. Ibid.

34. Ibid.

35. See The Bangladesh Gazette, No. 5, 29 January 1981, p. 28.

36. See Ministry of Establishment and Reorganization, A Handbook of Important Law, Rules & Orders on Personnel & Office Administration in Bangladesh, Dhaka, 1984, pp. 525-528.

37. See The Bangladesh Times, 20 August 1981.

38. Ministry of Establishment, National Training Policy, Dhaka, October, 1986.

39. Ibid., pp.i-ii.

১ম কর্ম অধিশেন ঃ

সভাপতিঃ জনাব এ,কে,এম,হেদায়েতুল হক ,
রেক্টর ।

বিষয় ঃ- জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতির ধারণাগত কাঠামো ।

প্রবন্ধকারঃ- ডঃ সৈয়দ গিয়াস উদ্দিন আহমেদ,
অধ্যাপক,
লোক প্রশাসন বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ।

বক্তাদের তালিকা ঃ-

১। ডঃ আকবর আলী খান ,
এম,ডি,এস
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ।

২। ডঃ মিজুনুর রহমান (শেলী)
চেয়ারম্যান ,
সেন্টার ফর ডেভলপমেন্ট রিসার্স ।

৩। জনাব এ,এফ,এম, আলমগীর,
যুগ্ম সম্পাদক,
পরিকল্পনা কমিশন ।

৪। জনাব আনওয়ারুল ইসলাম,
সম্পাদক ,
দৈনিকদেশ ।

সাধারন আলোচক ঃ-

১। জনাব মোঃ মজিবর রহমান ,
পরিচালক (পরিদর্শন ও প্রশিক্ষণ)(কের),

২। বেগম নিলুফার
পরিচালক,
একাডেমী ফর প্লানিং এন্ড ডেভলপমেন্ট ।

৩। জনাব মোশারফ হোসেন,
পরিচালক,
বিপিএটিসি, সাভার , ঢাকা ।

৪। জনাব সৈয়দ শামসুল ইমাম,
অনুষদ সদস্য
বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশিক্ষণ একাডেমী।

৫। ডঃ সালেহ উদ্দিন আহমেদ,
কর্মসূচী সমন্বয়কারী,
বাংলাদেশ রুরাল এডভান্সমেন্ট কমিটি (ব্রাক)

৬। জনাব শেখ মোস্তফা হোসেন,
পরিচালক,
ইঞ্জিনিয়ারিং একাডেমী,
ওয়াটার এন্ড পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড, কাপ্তাই।

৭। জনাব এ,বি,এম, সিদ্দিক,
অধ্যক্ষ,
পোস্টাল একাডেমী,
রাজশাহী।

৮। জনাব আনওয়ারুল হক,
এম,ডি;এস,
মিয়েয়ার।

৯। আবুল কাশেম মোহাম্মদ ফারুক,
অধ্যক্ষ,
বাংলাদেশ সমবায় কলেজ,
কোটবাড়ী, কুমিল্লা।

প্রবন্ধকার ঃ-

১০। প্রবন্ধকার অধ্যাপক গিয়াস উদ্দিন আহমেদ।

১১। সভাপতি
জনাব এ,কে,এম, হেদায়েতুল হক,
রেক্টর,
বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।

ডঃ আকবর আলী খান ঃ

ঐতিহাসিকদের মধ্যে মাঝে মাঝে কিছু কিছু হাস্যকর ও অর্থহীন বিতর্কের সৃষ্টি হতে দেখা যায়। যেমন - ক্লিওপেট্রার নাকের আয়তনের পরিবর্তন হলে ইতিহাসের গতিধারার কোন পরিবর্তন হতো ? কোন তাত্ত্বিক কাঠামোর বাইরে আলোচনা করতে গেলেই এ ধরনের বিভ্রান্তি ঘটে আর মূল বিষয় থেকে বিচ্যুতি ঘটে। এমনটি ঘটেছিল নাসির উদ্দিন হোজ্জার ক্ষেত্রেও। অন্ধকার সুরুংগে আংটি হারিয়ে শুধুমাত্র খুঁজতে সুবিধা হবে বলেই বাইরের আলোতে সে আংটি খুঁজেছে। আমরাও কোন প্রশ্ন আলোচনার ক্ষেত্রে অন্ধকার সুরুংগে ঢুকতে ভয় পাই। আর তা' করতে হলে আমাদের দরকার একটি তাত্ত্বিক কাঠামো।

ডঃ সৈয়দ গিয়াস উদ্দিন আহমেদকে তাই আমরা জাতীয় নীতির তাত্ত্বিক কাঠামো আলোচনার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলাম। তিনি এই কষ্টসাধ্য কাজটি সাধন করেছেন। তিনি অন্ধকার সুরুংগের ভিতরে ঢোকার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

ডঃ গিয়াস উদ্দিন আহমেদ সাহেবের বক্তব্য আমার অত্যন্ত ভালো লেগেছে, কয়েকটি বক্তব্যের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষন করছি। তিনি প্রশিক্ষণের জন্য কৌশলের কথা বলেছেন। এবং পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত বাধ্যতামূলক নিয়ম কানুন অনেক ক্যাডারের ক্ষেত্রে মানা হচ্ছে না তা বলেছেন। যদি আইন থাকে তবে আইনটি প্রয়োগ করা উচিত। কিন্তু যদি সরকার মনে করে যে ,আইনের প্রয়োজন নেই তবে তা তুলে দেয়া যেতে পারে। পদোন্নতির ব্যাপারে সরকারের বহু কিছু করার আছে। কিন্তু কর্মজীবণ সম্পর্কে শাসনতন্ত্রের অধীনে রুলস প্রণয়ন করা হয়েছে , সেই আইন অনুযায়ী বিধি প্রণয়ন করা হয়েছে - যা শাসনতন্ত্রের অংশ। কিন্তু এসব বিধি মানা হচ্ছে না। বর্তমানে যে একত্রিশটি ক্যাডার রয়েছে তাতে নবনিযুক্ত সকল কর্মকর্তার জন্য বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স বাধ্যতামূলক। কিন্তু আইন প্রনেতাগণ কি হিসেব করে দেখেছেন কি পরিমান 'ব্যাকলগ' রয়েছে এবং প্রতি বছর কি পরিমান নুতন কর্মকর্তা নিয়োগ করা হচ্ছে এবং বর্তমান সুবিধাদির সাহায্যে তাদের সবাইকে আদৌ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব কি না ?

প্রতি বছর প্রক হাজারেরও বেশী কর্মকর্তাকে চাকুরী দেয়া হচ্ছে। কৃষি, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা ক্যাডারে হাজার হাজার কর্মকর্তা রয়েছে যাদের আদৌ কোন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি। সরকার আইন প্রণয়ন করে রেখেছেন কিন্তু তা প্রয়োগ করছেন না। অবস্থাটা দুর্ভাগ্যজনক। ডঃ গিয়াস উদ্দিন এসব প্রশ্ন তার বক্তব্যে তুলে ধরেছেন। আমিও এ ব্যাপারে তার সাথে একমত।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা, ঘাটতি রয়েছে- যা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে আমাদেরকে পূরণ করতে হবে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন মানুষ সৃষ্টি করছি, শিক্ষিত মানুষ নয়। একবার এখানে পরীক্ষা না দেওয়ার জন্য শ'দেড়েক প্রশিক্ষণার্থী আন্দোলন করেছিল। এমনটি কেন ঘটলো? দেশের পরিস্থিতি, বাইরের বাতাবরণ তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে। সুতরাং গোটা দেশে যে নৈরাজ্য, সেই নৈরাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে দৃষ্টিভংগি পরিবর্তন করতে হলে শিক্ষার কতকগুলি দায়িত্ব প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের উপর বর্তায়। উন্নত বিশ্বে এমনটির দরকার হয় না। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রীধারীগণ যে রকম বাংলা লেখেন তাতে তাদের অনেকের পক্ষেই লিখিত প্রশাসন চালানো সম্ভব হবে না বলে আমার ধারনা। প্রশাসনে বাংলা রাখতেই হবে, তাই আমি মনে করি মাস দু'য়েকের বাংলা ভাষা প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। কিন্তু এটা এখন সম্ভব হচ্ছে না।

প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা সম্পর্ক এবং বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বিশেষ সমস্যা নিয়ে প্রবন্ধকার যদি তার প্রবন্ধটিতে আলোকপাত করতেন তবে এটা সমৃদ্ধতর হতো বলে আমার ধারণা। আমার ধারণা হাতে কলমে প্রশিক্ষণের বিষয়টি আলোচ্য প্রবন্ধে যথাযোগ্য গুরুত্বের সাথে স্থান পায়নি। হাতে কলমে প্রশিক্ষণকে আমি অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ন বলে মনে করি। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান আমার ক্ষেত্রে লাহোরের সিভিল সার্ভিস একাডেমী থেকে যে প্রশিক্ষণ আমি পেয়েছি তাতে হয়ত আমার দৃষ্টিভংগীর পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু মাঠে, দপ্তরের কাজে তা লাগেনি। দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের কাজ আমি শিখেছি উর্ধ্বতন অধস্তন কর্মকর্তা, কর্মচারীদের কাছ থেকে। তখনকার সময়ে হাতে কলমে শিক্ষার উপর জোর দেয়া হতো, জেলা প্রশাসক গণও ব্যক্তিগতভাবে তদারক করতেন। বর্তমানে এমন হয়েছে যে, শিক্ষানবিসগণ হয়ত কালভদ্রে জেলা প্রশাসকগনের দেখা পান, তাও সেটা সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার।

-৪২-

এর কারণও রয়েছে। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর প্রশিক্ষণ ততটা গুরুত্ব পায়নি বলে বহু কর্মকর্তা ভালোভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হতে পারে নি। তারা এখন মধ্য পর্যায়ে রয়েছেন। পুরো বিষয়টিকে আলোচনা ও বিশ্লেষন করে অবস্থার উন্নতি সাধন প্রয়োজন।

আমার ধারনা ও বিশ্বাস এই যে, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে যে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় তার চাইতে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ অনেক বেশী ফলপ্রসু হয়। মার্কিন অর্থনীতিবিদ জ্যাকব মিনসার বিশ্লেষন করে দেখিয়েছেন যে, আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কিংবা প্রশিক্ষণের চাইতে হাতে কলমে প্রশিক্ষণের 'ইন্টারন্যাল রেট অব রিটার্ণ' ৪-৫ গুন বেশী।

প্রশিক্ষণ কৌশল সম্পর্কেও আমাদেরকে নুতনভাবে চিন্তাভাবনা করতে হবে। বহুদিন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি; বহু কর্মচারীর [illegible] প্রশিক্ষণ বাকী রয়েছে। শুধুমাত্র দালানকোঠা বানিয়ে আমরা প্রশিক্ষণের চাহিদা মেটাতে পারব না। তাই প্রশিক্ষণ কৌশল পুরোপুরি বদলাতে হবে। সেই কৌশলে থাকবে তিনটি উপাদান ঃ প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ, হাতে কলমে প্রশিক্ষণ ও দূর প্রশিক্ষণ। শিক্ষা ক্ষেত্রে যেমন দূর শিক্ষা চালু রয়েছে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যবস্থা নিতে হবে। আর তার জন্য প্রশিক্ষণের সমস্ত উপকরণ বই পুস্তক, রুলস, রেগুলেশন, ম্যানুয়েল মুদ্রন করে ব্যবহারকারীদের পৌছে দিতে হবে। প্রত্যেক অফিসে প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষিত করে তুলতে হবে। তারা প্রতি অফিসে কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেবে। মান বজায় রাখার জন্য কেন্দ্রীয় ভাবে একটি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

আমি পরিশেষে বলতে চাই যে, পরিকল্পনা প্রণয়ন করাই যথেষ্ট নয়, পরিকল্পনা বাস্তবায়নেরও উদ্যোগ নেয়া দরকার এবং তা করার জন্য কি ব্যবস্থা নিতে হবে তাও পরিকল্পনার কাঠামোতে থাকা দরকার।

ডঃ মিজানুর রহমান (শেলী):

জাতীয় জীবনে অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার জন্য যেমন সুনির্দিষ্ট কোন বিষয় দীর্ঘকাল ধরে সুসম্পন্ন করা যাচ্ছে না, প্রশিক্ষকদের ব্যাপারেও এমনটি ঘটেছে।

প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় কোন সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে মনে রেখে। তার জন্য প্রথম দরকার উদ্দেশ্য অনুধাবন করা এবং তাকে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা। প্রশিক্ষকের মনে প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়াকেও করে তুলতে হবে বোধগম্য।

উদ্দেশ্য যদি স্পষ্ট থাকে, সে অনুসারে যদি নীতি প্রণীত হয়, পাঠক্রম তৈরী হয়, এবং তা বোধগম্য উপায়ে যদি প্রশিক্ষণার্থীর কাছে পৌঁছে দেয়া যায় তবে তা প্রশিক্ষণার্থীর জীবনে প্রয়োগযোগ্য হয় ।

একটি সরকারের বিভিন্ন নীতি সম্পর্কে যদি স্পষ্ট না হওয়া যায়, তাহলে আমরা আমাদের প্রশিক্ষণ নীতি আমাদের নিজেদের কাজে কি করে স্পষ্ট করে তুলব , বা প্রণয়ন করব, বা বাস্তবায়িত করব ? ডঃ খান ও ডঃ গিয়াস উদ্দিন ইংগিত করেছেন যে, জীবন বিচ্ছিন্ন , সমাজ বিচ্ছিন্ন কোন প্রশিক্ষণ হতে পারে না । আমরা প্রশিক্ষণ নীতি করব, উন্নয়ন নীতি করব পাঠ নীতি করব, যুবনীতি করব কিন্তু সম্পূর্ন প্রেক্ষিত নিয়ে কোন নীতি থাকবে না তাতো হতে পারে না ; তাহলে কোন বিচ্ছিন্ন নীতিই কাজ করবে না । সুতরাং আমাদের জন্য দরকার এই সম্পূর্ন প্রেক্ষিত, সেই রাজনৈতিক অংগীকার যা এইসব নীতিমালাকে সম্পূর্নতা দেবে ।

প্রশিক্ষণকে আকর্ষনীয় করে তোলার জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহন করা দরকার বলে আমি মনে করি । যিনি এই লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রধান হবেন তার এখানে দু'বছর কাটানোর পর আবশ্যিকভাবে সংস্থাপন অথবা মন্ত্রী পরিষদ সচিব হিসেবে নিয়োজিত করা হবে । এটাকে বিধিবদ্ধ করতে হবে ; আর তাছাড়া যারা প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করেন বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে তাদের সম্পর্কে যেন কখনো এমনটি না মনে করা হয় যে অন্য কোন নিয়োগের অভাবে তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে দেয়া হলো । তাহলে প্রশিক্ষণার্থীদের মনেও প্রশিক্ষণ সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধা জন্মাবে । প্রশিক্ষণও অর্থবহ হবে না ।

আজকের প্রশিক্ষণ এবং অভাবকে প্রভাবিত করেছে চারিদিকে পরিস্থিতি শূন্যতা, অস্থিরতা, ভীতি ও সিদ্ধানুহীনতা । উচ্চ মধ্য সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে আমরা দেখেছি বিভ্রান্তি, ভীতিচিত্ততা এবং সন্ত্রস্তভাব । কোটা ৫ ১৪৮৪টি নথি বিশ্লেষন করে একটি প্রতিবেদন রচনা করেছে যাতে তারা দেখিয়েছে যে , জাতীয় নীতিমূলক সিদ্ধানু গ্রহন করতে সাধারনতঃ প্রয়োজন হয় ২৮৯ দিন ; জাতীয় নীতির গৃহীত সিদ্ধানু বাস্তবায়িত হতে লাগে ৩১১ দিন ; এবং জাতীয় নীতিগত সিদ্ধানু গ্রহণের জন্য প্রয়োজন হয় ২৭ জন কর্মকর্তার স্বাক্ষর । সেই নীতি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন হয় ১৯ জন কর্মকর্তার স্বাক্ষরের । স্তরীভূত এই প্রশাসনিক ব্যবস্থার কারনে / প্রকল্প বাস্তবায়ন এর জন্য ৪ থেকে ৫ বছর সময় লাগে ।

উদ্দেশ্য যদি স্পষ্ট থাকে, সে অনুসারে যদি নীতি প্রণীত হয়, পাঠক্রম তৈরী হয়, এবং তা বোধগম্য উপায়ে যদি প্রশিক্ষণার্থীর কাছে পৌঁছে দেয়া যায় তবে তা প্রশিক্ষণার্থীর জীবনে প্রয়োগযোগ্য হয় ।

একটি সরকারের বিভিন্ন নীতি সম্পর্কে যদি স্পষ্ট না হওয়া যায়, তাহলে আমরা আমাদের প্রশিক্ষণ নীতি আমাদের নিজেদের কাজে কি করে স্পষ্ট করে তুলব , বা প্রণয়ন করব, বা বাস্তবায়িত করব ? ডঃ খান ও ডঃ গিয়াস উদ্দিন ইংগিত করেছেন যে, জীবন বিচ্ছিন্ন , সমাজ বিচ্ছিন্ন কোন প্রশিক্ষণ হতে পারে না । আমরা প্রশিক্ষণ নীতি করব, উন্নয়ন নীতি করব পাঠ নীতি করব, যুবনীতি করব কিন্তু সম্পূর্ন প্রেক্ষিত নিয়ে কোন নীতি থাকবে না তাতো হতে পারে না ; তাহলে কোন বিচ্ছিন্ন নীতিই কাজ করবে না । সুতরাং আমাদের জন্য দরকার এই সম্পূর্ন প্রেক্ষিত, সেই রাজনৈতিক অংগীকার যা এইসব নীতিমালাকে সম্পূর্নতা দেবে ।

প্রশিক্ষণকে আকর্ষনীয় করে তোলার জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহন করা দরকার বলে আমি মনে করি । যিনি এই লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রধান হবেন তার এখানে দু'বছর কাটানোর পর আবশ্যিকভাবে সংস্থাপন অথবা মন্ত্রী পরিষদ সচিব হিসেবে নিয়োজিত করা হবে । এটাকে বিধিবদ্ধ করতে হবে ; আর তাছাড়া যারা প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করেন বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে তাদের সম্পর্কে যেন কখনো এমনটি না মনে করা হয় যে অন্য কোন নিয়োগের অভাবে তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে দেয়া হলো । তাহলে প্রশিক্ষণার্থীদের মনেও প্রশিক্ষণ সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধা জন্মাবে । প্রশিক্ষণও অর্থবহ হবে না ।

আজকের প্রশিক্ষণ এবং অভাবকে প্রভাবিত করেছে চারিদিকে পরিস্থিতি শূন্যতা, অস্থিরতা, ভীতি ও সিদ্ধানুহীনতা । উচ্চ মধ্য সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে আমরা দেখেছি বিভ্রান্তি , ভীতিচিত্ততা এবং সন্ত্রস্ততাব । কোটা (১৪৮৪টি নথি বিশ্লেষন করে একটি প্রতিবেদন রচনা করেছে যাতে তারা দেখিয়েছে যে , জাতীয় নীতিমূলক সিদ্ধানু গ্রহন করতে সাধারনতঃ প্রয়োজন হয় ২৮৯ দিন , জাতীয় নীতির গৃহীত সিদ্ধানু বাস্তবায়িত হতে লাগে ৩৯১ দিন ; এবং জাতীয় নীতিগত সিদ্ধানু গ্রহণের জন্য প্রয়োজন হয় ২৭ জন কর্মকর্তার স্বাক্ষর । সেই নীতি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন হয় ১৯ জন কর্মকর্তার স্বাক্ষরের । শতরীভূত এই প্রশাসনিক ব্যবস্থার কারনে / প্রকল্প বাস্তবায়ন এর জন্য ৪ থেকে ৫ বছর সময় লাগে ।

এক বিদেশী কুটনৈতিক যিনি বাংলাদেশে অনেকদিন কাজ করেছেন একটি দলিলে singlemest লিখেছিলেন যে, '' The singlemost expressing fact for Bangladesh, of this region's troubled history lies in the lack of a long standing class accustomed through the root with a fully developed appreciation of the obligation and responsibilities of power and previledge and with a congenital awareness at the truth that freedome does not mean licence, it means discipline and responsibility. ''

দায়িত্বজ্ঞানহীন শাসককুল, দায়িত্বজ্ঞানহীণ শাসকশ্রেণী এবং তার মধ্যে বিজ্ঞানু অপ্রশিক্ষিত প্রশাসক যদি যোগ দেয় তবে সে সমাজে টিকে থাকা মুশকিল । কিন্তু কোনটা আমাদের আগে ঠিক করতে হবে ? জাতি না প্রশিক্ষণ নীতি ? কিছু একটা দিয়ে তো যাত্রা করতে হবে । আর কিছু না হউক একটা জাতীয় নীতি বা প্রশিক্ষণ নীতি দিয়ে তো আমরা শুরু করতে পারি ।

সেই শুরুর আশা নিয়ে এবং প্রবন্ধ লেখককে অভিনন্দন জানিয়ে শেষ করছি ।

জনাব এ,এফ, রহমান আলমগীর ঃ

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যকে এভাবে দেখা যেতে পারেঃ শিক্ষা জীবনের পর থাকে হাতে কলমে হোক, তাত্ত্বিক শিক্ষায় হোক, ক্লাশ লেকচারের মাধ্যমেই হোক কোন বিশেষ পেশা বা কাজে বিশেষভাবে দক্ষ করে তোলা । আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রসূত ধারনা এই যে , প্রশাসনের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য, সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য একটি সার্ভিস গড়ে তোলা, তা সেটা সরকারী বা বেসকারী যে সেক্টরেরই হোক না কেন।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচী তৈরী করার ব্যাপারে আমার মত হচ্ছে যে , প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, কেন্দ্রীয় এজেন্সী হিসেবে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিবৃন্দ প্রশিক্ষণ কর্মসূচী তৈরীতে অংশগ্রহণ করবেন । তাহলে যারা প্রশিক্ষণ করবে তাদের প্রশিক্ষণ চাহিদা কর্মসূচীতে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হবে এবং প্রশিক্ষণ ফলপ্রসু হবে ।

বৈদেশিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে আকর্ষণ বেশী । এর একটা অর্থনৈতিক লাভের দিক রয়েছে । দৈনন্দিন কাজের ঝামেলা মুক্ত হয়ে রিক্রিয়েশনের সুযোগ ঘটে তাতে । দেশী প্রশিক্ষণে তাত্ত্বিক দিকটা বেশী, সেটাও প্রশিক্ষণকে আকর্ষনীয় করে তোলার ক্ষেত্রে বাধাস্বরুপ ।

আরো প্রশ্ন তোলা যায় - প্রশিক্ষণ কি একজন কর্মকর্তাকে কিছুটা অসামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলে না ? একজন কর্মকর্তা কতটুকু কাজে লাগাতে পারেন তার প্রশিক্ষণ ? যে পরিস্থিতিতে তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, যে অগ্রাধিকারের বাছাই তার উপর চাপিয়ে দেয়া হয় তা কি তাকে কিছুটা নিরুৎসাহিত, কর্মবিমুখ করে তোলে না ?

একজন কর্মকর্তা একটি প্রশাসনিক সংস্কৃতির ভেতরে কাজ করেন । সেই প্রশাসনিক সংস্কৃতিতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তাদেরকে পরিবর্তন আনয়নকারী এজেন্ট হিসাবে কাজ করতে হবে । আমাদের প্রশিক্ষণ তৈরী করবে সেই পরিবর্তন আনয়নকারী এজেন্ট ।

আমাদের গোপনীয় প্রতিবেদনে ট্রেনিং এ ভালো ফল করার জন্য নম্বর কত ? সেটা কি একজন কর্মকর্তার কর্মজীবনে উন্নয়নে সহায়ক ? গোপনীয় প্রতিবেদন ফরম কি সেভাবে প্রনীত ? সুতরাং কোন কর্মকর্তা কেন দেশীয় প্রশিক্ষণে আকৃষ্ট হবেন ?

যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে আমাদের প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয় তার প্রতিফলন প্রশিক্ষণ নীতিমালায় থাকার প্রয়োজন । প্রশিক্ষণ নীতিমালা বাস্তবায়নে বাস্তব পদক্ষেপের নির্দেশও এই নীতিমালায় থাকা দরকার । এই নীতিমালায় বলা হয়েছে যে , প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেরাই নিজেদের খরচ নির্বাহ করবে । কিন্তু কি ভাবে করবে তার কোন দিশা এই নীতিমালায় নাই । তাই আমাদেরকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে প্রশিক্ষণ নীতি প্রণয়ন করতে হবে ।

আজকে আমাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে । কেন্দ্রীয় ভাবে বিপিএটিসি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং বিভিন্ন ক্যাডার ও সার্ভিসের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে । তাদের সবার কর্মের মধ্যে একটা সমন্বয় প্রয়োজন । আমাদের প্রশাসনের বিভিন্ন ক্যাডারে , বিভিন্ন বিভাগে, দপ্তরে যাঁরা বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে আসেন, উচ্চ শিক্ষা নিয়ে আসেন তাদের একটি কেন্দ্রীয় তালিকা প্রনীত হওয়া দরকার । তাদের মধ্যে পরস্পরের জানাশুনা এবং কর্মে একে অপরকে সাহায্য করার সুযোগ সৃষ্টি করারও দরকার । প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে অনুদেষ্টাদের উন্নয়নেরও কার্যকর ব্যবস্থাও নেওয়া দরকার ।

জনাব আনওয়ারুল ইসলাম ঃ

আজকের আলোচনা সভায় আসতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতির কাঠামো সম্পর্কে আজকের এই অধিবেশনের আলোচনা। প্রথমেই প্রশ্ন উঠে কাদের জন্য এই প্রশিক্ষণ কাঠামোর সৃষ্টি, তা প্রথমেই উপলব্ধি করা দরকার। আমার মতে সেই প্রশিক্ষণ কাঠামোর সৃষ্টি তাদের জন্য যাঁদের দায়িত্ব হবে আমাদের জনসাধারনের জন্য কল্যাণকর কিছু করা এবং বর্তমানে প্রশাসনের উন্নীত মান বজায় রাখা।

সুতরাং আমাদেরকে জাতীয় লক্ষ্য মনে রাখতে হবে, জনসাধারনকে কি সেবা আমরা দেব তার প্রতিও আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করা দরকার। জাতীয় লক্ষ্য যেহেতু রাজনৈতিকভাবে নির্ধারিত হয় সেহেতু আমাদের প্রশিক্ষণকার্যক্রমও সেই রাজনীতি ও জাতীয় লক্ষ্যকে মনে রেখে প্রণয়ন করতে হবে। এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম তখনই সুষ্ঠু হতে পারে যখন রাজনৈতিক স্থীতিশীলতা বজায় থাকে, লক্ষ্য সুষ্ঠু থাকে এবং রাজনৈতিক ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। আমরা সরকারী বিভিন্ন কর্মসূচী দেখেছি যেমন- গণশিক্ষা, খালকাটা, যেখানে সরকারী কর্মকর্তাগণ সম্পৃক্ত ছিলেন, কিন্তু রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সাথে সাথে তাতে ছেদ পড়েছে। নূতন কর্মসূচী এসেছে -যেমন উপজেলা পদ্ধতি। কিন্তু তাও কি নূতন কিছু ? ক্ষমতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা হয়তো বা এতে জড়িত। আগে ছিল টিটিডিসি, সেটা ছিল ভিত্তি, তার উপর আইয়ুব খান রাজত্ব করেছেন ১০ বছর ধরে।

বর্তমানে উপজেলায় প্রচুর কর্মকান্ড শুরু হয়েছে, আগে যেখানে ১ লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়া হতো, এখন সেখানে ১ কোটি টাকার অনুদান দেয়া হয়। তাকি বেশী কিছু ? কর্মচারী / কর্মকর্তাও বেড়েছে উপজেলায়। আমি এক সময় ম্যাজিস্ট্রেট ছিলাম। তখন অনেক কাজ করতে হতো ম্যাজিস্ট্রেসি ছাড়াও। এখন ম্যাজিস্ট্রেটগণ বিচারই করেন অন্য কিছু করতে পারেন না। এটা কি এক ধরনের জন শক্তির অপচয় নয় ? উপজেলা সৃষ্টির গোড়ার দিকে আমার মনে হয়েছিল উপজেলায় কর্মরত কর্মকর্তাদের উপজেলা সদর দপ্তরে ধরে রাখাই প্রশাসক হিসাবে আমার প্রধান সমস্যা। এই কথাগুলো আমার মধ্যে জাগ্রত হয়েছে এই ভেবে যে, আমাদের জাতীয় লক্ষ্য সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার, কিন্তু পরিতাপের বিষয় তা আমাদের নেই।

যাহোক , এখন সরকারী কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নের উপর, তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের উপর জোর দেয়া হচ্ছে , নুতন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নির্মিত হচ্ছে , প্রশিক্ষণ নীতি কাঠামো তৈরী হচ্ছে , সেটা খুব সুখের কথা ; আমাদের সময় এ রকম ব্যবস্থা-পনা ছিল না । বর্তমানের সুবিধা অপ্রতুল সে কথাও অনেকে বলেছেন । কোন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ না দিয়েই তাকে কর্মে নিয়োজিত করেন । তিনি কি করে সুষ্ঠুভাবে তার দায়িত্ব পালন করবেন ? এ অবস্থার মোকাবেলা আমাদের করতে হবে ।

ডঃ আকবর আলী খান এ সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে দূর প্রশিক্ষণের কথা বলেছেন, আমার মতে এ প্রস্তাবটি যথাযোগ্য গুরুত্ব পাওয়া দরকার । কারণ, আজকে উপজেলা পর্যায়ে যেভাবে প্রশাসন চলছে তা সত্যি একটি ভয়াবহ ব্যাপার ; এবং এ অবস্থানিরসন হওয়া দরকার ।

আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষার সংগে চাকুরী জীবনের কর্মের সঁংগতি নেই । প্রশিক্ষণ নীতির মধ্যে সেই অসংগতি ও ঘাটতি পূরণের কার্যকর প্রস্তাব এবং ব্যবস্থা থাকা দরকার । বর্তমানে জনপ্রতিনিধিগণ প্রশাসন কর্মে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছেন । প্রশিক্ষণ নীতিতে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার নির্দেশ থাকা দরকার ।সেই সাথে জনপ্রতিনিধিগণের সাথে সরকারী কর্মকর্তাদের সম্প্রীতি, আস্থা সৃষ্টির ব্যবস্থাও থাকা দরকার । শুধুমাত্র সরকারী কর্মকর্তা দিয়ে এই বিপুল জনগোষ্ঠীর প্রশাসন পরিচালনা করা সম্ভব নয়, জনগণের দুঃখ দুর্দশা মোচন সম্ভব নয় ,জনগণের প্রশাসনে অংশগ্রহন অপরিহার্য । আরেকটি কথা সুবিদিত যে, সর্বত্রই দুর্নীতির প্রসার ঘটেছে, প্রশাসনেও । আমরা যখন চাকুরীতে প্রবেশ করি তখন ব্যাপারটি এমন ছিল না । আমাদের সময় সরকারী কর্মচারীদের জীবন যাপন ছিল সাদাসিদা, এখন আর তা থাকছে না । বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে খতিয়ে দেখতে হবে সরকারী চাকুরীতে এখনও মর্যাদা রয়েছে । যারা সরকারী চাকুরীতে যোগ দেন তাদেরকে সীমিত আয়ের মধ্যে সাধারন জীবন যাপন করতে হবে । এতে অভ্যস্ত হতে হবে । যদি ব্যতিক্রম ঘটে তবে তিনি নিজেকে এবং সমাজকে উভয়কেই বিড়ম্বিত করবেন । সরকারী চাকুরীতে তার থাকা উচিত হবে না । বর্তমানের যে অবস্থা চারিদিকে দুর্নীতির যে ধ্বস নেমেছে তা সরকারী কর্মকর্তাদের জন্য সুনাম বয়ে আনছে না । সেজন্য আমাদের মধ্যে মুল্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিতে হবে ।

পরিশেষে আমি বলতে চাই যে , আমাদের প্রশিক্ষণের অবকাঠামোর মধ্যে দেশজ পরিস্থিতির প্রতি অবশ্যই যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা দরকার । প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এতে যথেষ্ট অবদান রাখতে পারে । তারা প্রশিক্ষণের জন্য বই পত্র লেখা, গবেষনা পরিচালনা করে দেশীয় সমস্যাকে আরো সুষ্ঠভাবে উপস্থাপন করতে পারে ।

জনাব মুজিবুর রহমান ঃ

মূল প্রবন্ধকারের আলোচনায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এ দুইটি বিষয়ে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এদের উদ্দেশ্যও আলাদা বলে চিহ্নিত হয়েছে । প্রশ্ন উঠেছে যে, বর্তমানের যে শিক্ষা তা কাজে লাগছে না । তাই শিক্ষাকে সাংগঠনিকভাবে পুণর্বিবেচনা করা দরকার যাতে শিক্ষা আমাদের জীবনে কাজে লাগে । প্রশিক্ষণ আমাদের কর্মক্ষেত্র বিশেষ কাজের জন্য দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এমন ভাবে ঢেলে সাজানো দরকার যাতে প্রশিক্ষণের কিছু কাজ শিক্ষা সম্পন্ন করতে পারে । শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পুরোপুরিভাবে আলাদা করা যাবে না । তাই যারা প্রশিক্ষণ নীতি প্রণেতা তাদের কাছে আমার অনুরোধ যেন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকে আলাদা ভাবে না দেখেন । একই নীতির অংশ হিসাবে তা প্রণয়ন করা দরকার ।

বেগম নীলুফার বেগম ঃ

আমি একটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করব । কথা উঠেছে যে , অনেক সময় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রশিক্ষণের জন্য যে পরিমান আয়োজন করে সে পরিমান প্রশিক্ষণার্থী পায় না । কথাটা অনেকাংশে সত্য । এর জন্য আন্তঃ মন্ত্রণালয়ের সুষ্ঠু যোগাযোগ এর অভাব মূলতঃ দায়ী । তাছাড়া আরো দুইটি বিষয় এর পিছনে কাজ করে বলে আমি মনে করি । সেগুলো হচ্ছে - প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের অবস্থান, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সুনাম ।

জনাব মোশারফ হোসেন ঃ

মূল প্রবন্ধকারের নিকট আমার প্রশ্ন - পরিকল্পনা ও নীতির মধ্যে তিনি কি কোন ভেদরেখা টানেন?. প্রবন্ধটি পড়ে আমার মনে হয়েছে যে , প্রবন্ধকার নীতি সম্পর্কে তেমন কিছু বলেন নি, পরিকল্পনা সম্পর্কেই শুধুমাত্র বলেছেন ।

আমাদের ধারণা নীতিকে কেন্দ্র করেই পরিকল্পনা তৈরী হয় । তার লেখা বক্তব্যে পরিকল্পনাই স্থান পেয়েছে, নীতি নয় ; এই আমার বিশ্বাস । তিনি শিক্ষানীতি সম্পর্কে বলেছেন কিন্তু টার্মটি তার প্রবন্ধে স্পষ্ট করেন নি । অন্যান্য নীতি সম্পর্কে যা তিনি প্রবন্ধে বলেছেন সেই সম্পর্কেও ব্যাখ্যা থাকা দরকার ।

প্রবন্ধকার বিভিন্ন দেশের প্রশিক্ষণের কথা বলেছেন । কিন্তু সেই সব দেশে কোন প্রশিক্ষণ নীতি আছে কি ? তা যদি তার প্রবন্ধে উল্লেখ থাকত তবে আমরা আরো উপকৃত হতাম । আমার মনে এ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে- আদৌ কোন প্রশিক্ষণ নীতির দরকার আছে কি না ? আমার মতে প্রশিক্ষণ নীতিতে থাকা উচিত একটি Breed Guidline । জনপ্রতিনিধিদেরকে সরকারী কর্মচারীদের সাথে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে , প্রশিক্ষণে Professionlism সৃষ্টি করা হবে , প্রশিক্ষণে flexibility থাকবে, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে স্বায়ত্বশাসন থাকবে, এদের incentive structure ভিন্ন হবে ; এগুলো হতে পারে প্রশিক্ষণ নীতি । আর তাছাড়া কেউ কেউ বলেছেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অপূর্ন কাজ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে সম্পন্ন করতে হবে । এ সব বিষয়দি থাকবে প্রশিক্ষণ নীতিতে ।

ডঃ সালাহ উদ্দিন আহমেদ ঃ

আমি ব্র্যাক নামে একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে এসেছি । আমি প্রথমে ব্র্যাকের কার্যএক্সমের কিছু দিক তুলে ধরব । ব্র্যাকের প্রধান কাজ হচ্ছে গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে বিভিন্ন সামাজিক অর্থনৈতিক ক্রিয়াকান্ডে তাঁদেরকে জড়িত করা । এই সাধারন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য আমরা ব্র্যাকের তিনটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি । এর একটি কেন্দ্র হচ্ছে সাভারের খাগানে । আমাদের প্রশিক্ষণ কার্যএক্সমে দুইটি উদ্দেশ্য রয়েছেঃ- একটি হচ্ছে গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণকে মানবিক দিক সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয়া, আর একটি দিক হচ্ছে তাদেরকে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে দক্ষ করে তোলা । আমরা ব্র্যাকে কর্মরত সাতাস শত কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দেই ।

আমি আজ এখানে এই কর্মশালায় এসে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি । আমি মনে করি যে, বাংলাদেশে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে যে বিভিন্ন কার্যএক্সম রয়েছে তার মধ্যে একটা সমন্বয় দরকার । সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে উন্নয়ন প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে যে কার্যএক্সমের অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে তার মধ্যে লেনদেন হলে আমার ধারনা সবাই পরস্পরের কার্যএক্সম থেকে প্রভূতভাবে লাভবান হবে এবং পরস্পরের মধ্যে বিরাজমান সন্দেহ দুরীভূত হবে ।

এই কর্মশালার মধ্যে দিয়ে লেনদেনের একটা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, এটা খুব ভাল লক্ষণ বলে আমি মনে করি ।

একটা কথা বলা হয়ে থাকে যে, সরকারী প্রতিষ্ঠানের সীমিত এবং সীমিত আয়ের মধ্যে থেকে তাদেরকে কাজ করতে হবে । আমার মনে হয় এ ব্যাপারে উদাহরণ সৃষ্টি করা দরকার এবং এটা তাদেরকেই করতে হবে যারা প্রশিক্ষণ দেন ।

ব্র্যাকে আমরা জনগনকে সংগঠিত করছি, সরকারী ও বেসরকারী যে সকল কৃত্যক রয়েছে তার জন্য চাপ সৃষ্টি হচ্ছে । নীচে থেকে চাপ সৃষ্টি হলে উপরের সিস্টেম সাড়া দিতে বাধ্য হবে এটাই লক্ষ্য, কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি তা পুরাপুরি হচ্ছে না । এই সিস্টেম-টাকে এই চাপে সাড়া দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করতে হবে । সেকাজে বিপিএটিসির যেমন ভূমিকা রয়েছে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে ব্র্যাকেরও তেমনি দায়িত্ব রয়েছে । আমার ধারনা ব্যবস্থাপনায় যে মুল দিক - মানুষ, তাকে আমরা এখনও মানুষ বলে গন্য করছি না । আমরা মানুষের মানবিক চাহিদার দিকে দৃষ্টিপাত করি না বলেই আমাদের Management by concern আর হয়ে উঠে না । তাই আমি ব্যবস্থাপনার মানবিক দিকটার উপর জোর দেবার জন্য আবেদন জানাচ্ছি ।

জনাব শেখ মোস্তফা হোসেন ঃ

দূর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিলে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয়া দরকার সর্বাগ্রে ।

ব্যবস্থাপনার প্রশিক্ষণের জন্য আমাদের দেশে ফিল্ম বা ভিডিও নেই । আমরা স্থানীয়ভাবে যে সব ফিল্ম তৈরী করতে পারি । বিপিএটিসি এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে । প্রশিক্ষণ উপকরণের সুষ্ঠু ব্যবস্থারও নিশ্চিত করা দরকার ।

জনাব সৈয়দ সাইফুল ইমাম ঃ

এখানে আলোচিত হয়েছে যে , বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণের সুযোগ সীমিত । কিন্তু প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা অনেক । বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রশিক্ষণ একাডেমীর অবস্থাটা ঠিক এর বিপরীত । অনেক সময়ই আমাদের প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণার্থীর অভাব ঘটে । যদিও একটি আদর্শ ক্লাশের সংখ্যা হওয়া উচিত পঁচিশ, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, আট দশ কিংবা অনুরুপ সংখ্যক প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করতে হয় ।

আজকাল বিকেন্দ্রীকরণের উপর জোর দেয়া হচ্ছে কিন্তু সেই সংগে ব্যাংকিং সেক্টরে প্রশিক্ষণ একাডেমী গুলোর কেন্দ্রীকরণ চলছে । বিষয়টির মধ্যে এক ধরনের সুবিরোধিতা রয়েছে বলে আমার মনে হয় ।

আজকের প্রাবন্ধিক তার প্রবন্ধে বলেছেন যে, The motive and scope of training may also be duly delineated through a policy announcement. For Example, a government may find considerable on importance to in-service training and not less to pre-entry training. It may support in service training through its own institutes and assing only limited pole to self development of personnel through non-govt. Institutions.

আমার ধারণা বিষয়টি বিশদভাবে এবং আরো স্পষ্ট করে ব্যক্ত করা দরকার ।

জনাব এ,বি,এম, সিদ্দিক ঃ

আমি একটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিতে চাই । সেটা হচ্ছে প্রশিক্ষকের প্রতি সবার অনুকুল মনোভাব । প্রশিক্ষণ নেয়া বা প্রশিক্ষিত লোকজনকে যোগ্য স্থানে নিয়োগ করার ব্যাপারে বিভিন্ন স্তরে অনাগ্রহ ও বিভ্রান্তি রয়েছে । আমরা আরোও দেখেছি যে, বিদেশে কোন বিশেষ দক্ষতা অর্জন সম্পন্ন করে কর্মকর্তাগণ দেশে ফিরে এলে তাদের সেই প্রশিক্ষণ কে কাজে লাগানো হয় না বা সেই প্রশিক্ষণ অন্যকের মধ্যে বিতরণ করার সুযোগ দেয়া হয় না ।

প্রশিক্ষকদের উন্নয়নের বিষয়টি প্রশিক্ষণ নীতিতে বর্ণিত থাকা দরকার । প্রশিক্ষক তৈরী করে নিতে হয়, কেউ জন্মসূত্রে প্রশিক্ষক নন । প্রশিক্ষকের দক্ষতার উপর প্রশিক্ষণের মান ও আকর্ষণ অনেকটা নির্ভরশীল । কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই প্রশিক্ষণ প্রদান অনিচ্ছুক বা বিশেষ ভাবে যোগ্য নয় এমন লোককে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ করা হয় বলে প্রশিক্ষণের সুষ্ঠুতা ব্যহত হয় । বিষয়গুলো প্রবন্ধে আলোচিত হতে পারতো।

আমাদের দেশে পেশাধারী প্রশিক্ষকদের কোন সমিতি বা এসোসিয়েশন নেই । সরকারের কাছে বিভিন্ন দাবী ও সমস্যা তুলে ধরার জন্য এরকম সমিতি থাকা দরকার ।

বর্তমানে সরকারী ভাবে এবং সর্বত্রই বাংলা ভাষার উপর জোর দেয়া হচ্ছে । কিন্তু যারা শুধুমাত্র বাংলাভাষা পড়ে প্রশিক্ষণ নিতে আসেন তাদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে , তাঁরা তাত্ত্বিক ভাবে একটু দুর্বল থাকেন । শিক্ষার মাধ্যমটি কি হবে এবং হওয়া উচিত এবং তা করতে গেলে কি কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া দরকার তার উপর প্রবন্ধকার যদি আলোকপাত করতেন তবে আমরা উপকৃত হতাম । প্রশিক্ষণ নীতিতেও এ বিষয়টির উপর আলোচনা থাকা দরকার ।

জনাব আনোয়ারুল হক ঃ

আমি শুধু একটি বিষয়ের অবতারনা করব । সেটি হচ্ছে শিক্ষার মাধ্যম । আমাদের শিক্ষার মাধ্যম কি হবে সেটা প্রবন্ধকার যদি স্পষ্ট করে তুলতেন তাহলে আমরা উপকৃত হতাম । আমাদের শিক্ষার কতটুকু বাংলা , কতটুকু ইংরেজী হবে , ইংরেজী আদৌ থাকবে কি না , থাকলে তাকে কতটুকু গুরুত্ব দেয়া হবে , তা' স্পষ্টভাবে একটা জাতীয় শিক্ষা নীতিতে বিধৃত হওয়া দরকার । আমরা কি ইংরেজী পুরোপুরী বাদ দেব ? আর দিলে তা' কি আমাদের জাতীয় স্বার্থের অনুকুল হবে ?

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল , এটা সুবিদিত । তাই প্রশিক্ষণে যদি সেটা পুরণ করতে হয় তবে সেখানে আমার ধারণা ইংরেজী ভাষা শিক্ষার উপর জোর দেয়া দরকার । কারণ, সরকারী কর্মকর্তা ও প্রশাসকদের ভাষা দক্ষতা থাকা অত্যন্ত জরুরী ।

বর্তমানে যে পদ্ধতি আমাদের এখানে চালু আছে , তাতে ভাষা শিক্ষার সুযোগ অত্যন্ত কম । আপনারা জানেন যে , দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর হতে ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে পদ্ধতিগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে প্রচুর , এটা আরো বিজ্ঞান সম্মত হয়েছে । সাহিত্যের মাধ্যমে ভাষা শিক্ষার যে প্রচলন তা আর নেই । এস এস সি স্তর পর্যন্ত এখন ভাষা শিক্ষা পদ্ধতি সম্বলন ইংরেজী বই চালু রয়েছে , এইচ এস সি'তে তা একবার চালু করা হয়েছিল , কিন্তু পরে তা বাতিল করা হয় ।

আমাদের লক্ষ্য কি সাহিত্য পাঠ না ভাষা শিক্ষা । ভাষা শিক্ষা পুর্নাংগ না হলে তো সাহিত্য পাঠও যথাযথ হবে না । সাহিত্যের মাধ্যমে ভাষা শিক্ষার কর্মটি উচ্চতর স্তরে ফলপ্রসু হতে পারে । তাই আমার বক্তব্য হচ্ছে যে , প্রশিক্ষণের ভাষা নির্ধারণের ব্যাপারটি সুষ্ঠু করে তোলা দরকার ।

জনাব আবুল কাশেম মোহাম্মদ ফারুকঃ

প্রবন্ধকার অত্যন্ত সুলিখিত একটি প্রবন্ধে জোরালো বক্তব্য রেখেছেন। আমার ধারণা এই প্রবন্ধটিতে যদি প্রশিক্ষণ পদ্ধতি বিজ্ঞান ও কৌশল এই বিষয়ের উপর আলোচনা থাকত তবে প্রবন্ধটি আরো সমৃদ্ধ হতো। বর্তমান বিশ্বে অংশগ্রহণমূলক প্রশিক্ষণের উপর জোর দেয়া হচ্ছে, কিন্তু আমরা পুর্বেকার সেই শ্রেণীকক্ষ বক্তৃতার উপরই নির্ভর করে আছি। এর অবসান হওয়া দরকার যাতে প্রশিক্ষণ আরো কার্যকর ও ফলপ্রসু হতে পারে। প্রবন্ধকার প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ও এর কাঠামো সম্পর্কে বলেছেন কিন্তু এর বাস্তবায়ন ও মুল্যায়নের বিষয়ে বিশদ আলোকপাত করেন নি। তিনি প্রশিক্ষণের মুল্যায়ন আলোচনা করতে গিয়ে ষাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ কার্যকর হচ্ছে কি না তা বলেছেন। কিন্তু প্রশিক্ষকদের মুল্যায়ন, তাদের দক্ষতা ও কার্যকারিতার বিষয়ে কোন কিছু ব্যাখ্যা প্রদান করেন নি। অনেকে বলেছেন যে, তুলনামুলক-ভাবে অযোগ্য লোকজনকে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষক হিসাবে পাঠানো হয়। কিন্তু তাঁরা সেই প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে গিয়ে তাঁদের দক্ষতা কতটুকু বাড়াতে পেরেছে তার মুল্যায়ন হওয়া দরকার। তাই শুধু প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা নয়, প্রশিক্ষক ও কর্মসূচীর কার্যকারিতারও মুল্যায়ন হওয়া দরকার।

অন্য একজন বক্তা প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণের কথা বলেছেন। আমার মনে হয় বিষয়টির উপর জোর দেয়া দরকার। দেশে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা না থাকার জন্য আমরা এ ব্যাপারে বিদেশের উপর অনেক নির্ভরশীল। আমার ধারনা কেন্দ্রীয় এবং সর্বোচ্চ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিপিএটিসি এই দায়িত্ব নিতে পারে। এবং দেশের সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। বিপিএটিসিতে এ ব্যাপারে দক্ষ প্রশিক্ষকের অভাব থাকলে বিদেশী প্রশিক্ষক এনে প্রাথমিকভাবে সে অভাব পুরণ করা যেতে পারে।

ডঃ গিয়াস উদ্দিন আহমেদ,
(প্রবন্ধ আলোচনার জবাবে) ঃ

প্রবন্ধের উপর সুন্দর আলোচনা করার জন্য আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আশা করেছিলাম যে, আমাদের আজকের আলোচনা প্রবন্ধের উপর সীমিত থাকবে, আরো বেশী আলোচিত হবে এবং আমি নিজেকে শুধরে নেবার সুযোগ পাব। হয়ত সময়াভাবে তা সম্ভব হয় নি।

ডঃ আকবর আলী খান বলেছেন যে আমি সুরুংগে ঢোকার চেষ্টা করেছি । তা' অনেকাংশে হয়ত সত্যি, আমি তাত্ত্বিক দিকে জোর দিয়েছি । সেই সাথে আমি ফলিত দিকেও আলোচনার প্রচেষ্টা চালিয়েছি, যাতে আলোচনা বিরক্তিকর এবং অনাকর্ষনীয় না হয়ে উঠে । তাত্ত্বিক দিকের সাথে ফলিত দিকের আলোচনায় বিষয়টি তার পূনাংগ অবয়ব নিয়ে প্রকাশ পাবে বলে আমার বিশ্বাস ॥

দু'একজন সমালোচকের সাথে আমিও একমত যে, ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের উপর একটি অধ্যায় প্রবন্ধে থাকা দরকার । এটার উপর আজকাল খুব জোর দেয়া হচ্ছে ।

প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার মধ্যে একটা ভেদরেখা টানার চেষ্টা করেছি আমি আমার প্রবন্ধে । প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার মধ্যে তো পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে । শিক্ষা একটা সামগ্রিক প্রস্তুতি, অপরপক্ষে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় চাকুরী সম্পর্কিত দক্ষতা অর্জনের প্রয়াসে । কিন্তু আমাদের মত দেশে প্রশিক্ষণ ও চাকুরী পূর্ব প্রশিক্ষণে শিক্ষার বিভিন্ন উপাদান যুক্ত করতে হবে । শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মধ্যে সংহতি রয়েছে ।

মোশারফ সাহেব নীতি ও পরিকল্পনার মধ্যে যে ভেদরেখা টেনেছেন তা যথার্থ । আমি আমার প্রবন্ধে নীতির উপরেই জোর দিয়েছি । যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে নীতির বেলায় আমি পরিকল্পনা শব্দটি ব্যবহার করেছি । জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতির ক্ষেত্রে এ ধরণের বিভ্রান্তি ঘটেছে । মোশারফ সাহেব তার বক্তব্যে নীতি ও পরিকল্পনা বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন । প্রতিটি পরিকল্পনারই একটা সময় সীমা থাকে , লক্ষ্য থাকে , আর আমরা সেই লক্ষ্য অর্জন করতে চেষ্টা করি । পরিকল্পনা অনেকটা সংখ্যাগত বিষয়, নীতি গুণগত বিষয় । আমি আমার প্রবন্ধের অসামঞ্জস্যতা দূর করার চেষ্টা করব ।

মোশারফ সাহেব প্রশ্ন তুলেছেন যে , যে সকল দেশের প্রশিক্ষণের কথা আলোচনা করা হয়েছে সে সকল দেশে প্রশিক্ষণ নীতি রয়েছে কি না ? হ্যা, রয়েছে । উদাহরণ স্বরুপ বলা যায় ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য-এ সকল দেশে প্রশিক্ষণ নীতি রয়েছে । ব্রিটেনে ১৯৪৪ সালে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের উপর প্রতিবেদন তৈরী করা হয় । তবে পাশের দেশগুলো যেমনঃ- ভারত, পাকিস্তান সেখানকার অবস্থা উন্নত নয় । উন্নত দেশগুলোতে প্রশিক্ষণ নীতির ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় ।

জনাব সাহুফুল ইমাম সাহেব of policy objectives
এর ব্যাখ্যা পেয়েছেন। প্রবন্ধে আমি তা বলার চেষ্টা করেছি। Policy objective মানে এর প্রকৃতি ও পরিধি স্পষ্টভাবে বিধৃত থাকা দরকার। যেমন ধরুন আমাদের প্রশিক্ষণগুলো সরকারী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে না বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে হবে তা বর্ণিত থাকতে হবে। যেমন ডাক্তারদের ইন্টার্নীশীপকে প্রশিক্ষণের অংশ ধরা হচ্ছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যদিও এটা হচ্ছে তবু এটা প্রশিক্ষণ হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে। এটাই নীতিগত সিদ্ধান্ত। সুতরাং প্রশিক্ষণ নীতির ব্যাখ্যায় এটা থাকা দরকার।

সিদ্দিক সাহেব প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণের কথা বলেছেন। বিষয়টি প্রশিক্ষণ কৌশল হিসেবে পরিগনিত হয়, নীতি হিসেবে নয়। তাই এটা আলোচনায় আসেনি। আমি নীতির উপরই জোর দিয়েছি প্রবন্ধে, আমি প্রশিক্ষণের পেশাধারী উন্নয়নের কথা বলেছি। প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ এর অন্তর্ভুক্ত।

আরেকটি বিষয় আলোচিত হয়েছে এখানে সেটা হচ্ছে এনজিওদের প্রদত্ত প্রশিক্ষণ। এর মূল্যায়ন অত্যন্ত জটিল। শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতায় তা হতে পারে।

জনাব এ,কে,এম, হেদায়েতুল হক, সভাপতি ঃ

আমার প্রথমে বলার দরকার যে, দেশের সমস্ত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সৌহার্দ্য ও যোগাযোগ সৃষ্টির জন্যই মূলতঃ এই কর্মশালার আয়োজন। এখানে অনেকে বক্তব্য রেখেছেন ঃ সংক্ষেপে সেগুলো তুলে ধরতে চাই।

ডঃ আকবর আলী খান বলেছেন যে, আলোচনা কাঠামোর সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া উচিত, প্রশিক্ষণের অগ্রাধিকার প্রাপ্যিযোগ্য বিষয়গুলো নির্ধারণ করা দরকার এবং পদোন্নতির সংগে কর্মজীবন প্রশিক্ষণকে সম্পৃক্ত করা দরকার। আমাদের প্রশাসনিক কাঠামো Resppnsive নয়, তাকে responsive করা দরকার।

জনাব মোস্তাক আহমেদ পরিবেশ দূষণবোধ, মেয়েদের প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য সচেতনতা, ফিল্ম ও ভিসিআর এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং নৈতিক প্রশিক্ষণের উপর আলোকপাত করে বক্তব্য রেখেছেন।

জনাব সিদ্দিক আমাদের বক্তব্য ও কার্যের মধ্যে ব্যবধান দূর করা ও শঠতা পরিহার করার কথা বলেছেন। প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ সম্পর্কেও তিনি ব্যবস্থা গ্রহনের আহবান জানিয়েছেন। পেশাধারী প্রশিক্ষকদের সংগঠন সৃষ্টির উপর তিনি জোর দিয়েছেন। তিনি প্রশিক্ষণ মাধ্যমের বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

জনাব আনওয়ারুল হক ভাষার প্রশ্নে জাতীয় নীতির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দাবী করেছেন। জনাব আবুল কাশেম প্রশিক্ষণ নীতিতে প্রশিক্ষণ পদ্ধতি বিজ্ঞান, বাস্তবায়ন, কর্মসূচী মূল্যায়ন ও প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা যাচাই এই সব বিষয়ে যুক্ত করার কথা বলেছেন। এই কেন্দ্রে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করার কথা তিনি প্রস্তাব করেছেন। সবার অবগতির জন্য আমরা জানাচ্ছি যে, আমরা এখানে কয়েকটি প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স করেছি; অভিজ্ঞতার আলোকে আরো কিছু কোর্স আমরা পরিচালনা করব ভবিষ্যতে।

জাতীয় লক্ষ্য ও রাজনৈতিক অভীষ্ট নিয়েও আলোচনা হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ভেদরেখা নিয়ে। জনপ্রতিনিধিবর্গকে প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেছেন কেউ কেউ। সবার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে আমরা ইতিমধ্যে একটি কোর্স পরিচালনা করেছি। এবং সংসদ সদস্য, সচিব, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, কমিশনার, জেলা প্রশাসক, ইউ এন ও, ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের দল গঠন কোর্স আমরা ভবিষ্যতে পরিচালনা করতে যাচ্ছি। বাংলাদেশের ইতিহাসে এটাই প্রথম এ ধরনের কোর্স।

একজন বক্তা দুর্নীতির উপরে আলোচনা করেছেন, সমস্যাটি সত্যি প্রকট আকার ধারণ করেছে। তিনি প্রশিক্ষণে দেশজ উপাদানের উপরও জোর দিয়েছেন।

মুজিবুর রহমান সাহেব প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সংগতি রক্ষার কথা বলেছেন।

বেগম নীলুফার বলেছেন যে, তাঁর প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীর আধিক্য দেখা যায়। প্রতিষ্ঠানের অবস্থানগত সুবিধা, আন্তঃ যোগাযোগ ও প্রতিষ্ঠানের সুনামকে তিনি এর কারণ বলে মনে করেন। অপরপক্ষে জনাব সাইফুল ইমামের প্রতিষ্ঠানে এই উপাদান থাকা সত্ত্বেও প্রশিক্ষণার্থীর স্বল্পতা দেখা যাচ্ছে। জনাব সাইফুল ইমাম ব্যাংকিং সেক্টরে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীকরণের সমস্যার কথাও বলেছেন।

মোশারফ হোসেন তিনিও পরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত করেছেন। এবং এ ব্যাপারে প্রবন্ধকারের ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছেন। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন প্রশিক্ষণ নীতি আদৌ থাকা দরকার কি না ?

ডঃ সালাহ উদ্দিন আহমেদ মানবিক প্রশিক্ষণের উপর জোর দিয়ে ব্রাকের কার্যক্রম তুলে ধরেছেন। তিনি সরকার ও বেসরকারী সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে আরও যোগাযোগ জোরদার করার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, আমাদের প্রশাসনিক কাঠামো রিসপনসিভ নয়, একে রিসপনসিভ করা দরকার।

আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আমরা আপনাদের মূল্যবান বক্তব্য, এই কার্য-বিবরণীতে ছাপিয়ে বই আকারে প্রকাশ করার আশ্বাস দিয়ে শেষ করছি।

BPATC/PPA-641.
Dt.07.06.87.

আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ উন্নয়নের কলাকৌশল ।

ডঃ শেখ মাকসুদ আলী ।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে ও উন্নয়ন প্রশাসনে সরকারী কর্মচারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য । এ ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সরকারী কর্মচারীদের দক্ষতাবৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাব্যতা সম্পর্কে ১৯৬০ শতকে আমাদের বিদেশী সাহায্যদাতা দেশ ও সংস্থাগুলি খুব জোরালোভাবে আমাদের বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন । তাদের বক্তব্যের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিলো ঃ

(ক) অনুন্নতদেশে উন্নতি আনয়ন এমন কোন কঠিন কাজ নয় । উন্নয়নের মূল চাবীকাঠি হচ্ছে মূলধন সৃষ্টি ও তার সার্থক বিনিয়োগ । অনুন্নত দেশের মূলধনের প্রাথমিক ঘাটতি উন্নত দেশ ও তাদের সাহায্য সংস্থা পূষিয়ে দিতে পারে । এই বাড়তি মূলধন এবং সেই সংগে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও প্রযুক্তি সাহায্য যদি অনুন্নত দেশগুলি সঠিকভাবে নেয় এবং ব্যবহার করতে পারে তবে তাদের উৎপাদন ক্ষমতা, আয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বেড়ে যেতে বাধ্য এবং কয়েক দশকের মধ্যেই অনুন্নতদেশগুলি উন্নয়নের গতিধারা একটি সম্মানজনক পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে ।

(খ) এ ধরণের উন্নয়ন গতিধারাকে বুঝতে হলে এবং অনুন্নতদেশে কার্যকারীভাবে তা বাস্তবায়িত করতে হলে সরকারী কর্মচারীদের এই ধরণের উন্নয়ন অর্থনীতিতে ও উন্নয়ন প্রশাসনে ব্যাপক প্রশিক্ষণ নিতে হবে । প্রথম দিকে এ ধরণের প্রশিক্ষণ প্রধানতঃ বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও প্রশিক্ষণ সংস্থাগুলিতেই হতে হবে। ধীরে ধীরে এ ধরণের প্রশিক্ষণ দিবার ক্ষমতা দেশীয় প্রশিক্ষকদের উপর গুরুত্ব হিসাবে সম্প্রসারণ করা যাবে । ১৯৫৩ সাল থেকেই বড় বড় বিদেশী প্রশিক্ষকবিদরা আমাদের দেশে আসতে থাকে । ১৯৫৪ সালে আমাদের দেশে পরিকল্পনা প্রনয়ন কাজে সহায়তা করার জন্য আর এক দল (হাবার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীক) বিশেষজ্ঞ এ দেশে আসেন । ১৯৬০ দশকে প্রথম দিক থেকে ব্যপকভাবে সরকারী কর্মচারীদের বিদেশে প্রশিক্ষণ দেবার কাজ শুরু হয় । এবং ঐ সংগে বিদেশী সাহায্যে এ দেশে ও বেশ কয়েকটি পরিপুরক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (প্রশাসনিক ষ্টাফ কলেজ, নিপা, ইত্যাদি) সৃষ্টি হয় ।

(গ) একই সংগে সরকারী কর্মচারীগণকে শুধু শহর কেন্দ্রীক নয় । গ্রামোন্নয়ন কাজেও তাহাদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য কিছু ভিন্ন ধর্মী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয় । বলা হয়, অনুন্নত দেশে অধিকাংশ লোকের বাস গ্রামে সুতরাং গ্রামের মানুষকে উন্নয়ন কর্মকান্ডের সংগে সম্পৃক্ত না করতে পারলে উন্নয়নের হার ত্বরান্বিত হবে না । ১৯৬০ দশকে বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী আবির্ভাব এই দর্শনেরই প্রত্যক্ষ ফল ।

১৯৬০ দশকে এ সব প্রশিক্ষণ একাডেমী গুলিতে যে সব প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গড়ে তোলা হয়েছিল, তা ছিলো বেশ একটা আত্মপ্রত্যয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিদেশী বিশেষজ্ঞগণ আমাদেরকে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরী করে দিয়েছিলেন। আমাদের ব্যবস্থাপনা ও অর্থনীতি ও সামাজিক কাঠামোর রন্ধ্রে রন্ধ্রে এই সব প্রশিক্ষণ মডিউল বিদেশী ধ্যান ধারণা ও তার কার্যদক্ষতা ছড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু তাতে আমরা কতটা উপকৃত হয়েছিলাম ?

১৯৭০ দশক এদিক থেকে কিছুটা আত্মসমালোচনার দিক। ১৯৭০ দশকে যে সব প্রশ্ন আমাদের আলোড়িত করেছিল তা ছিল প্রধানতঃ

১। সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে জেনারালিষ্ট ও টেকনিক্যাল অফিসারদের মধ্যে দ্বন্দ্ব। ১৯৫০ - ৬০ দশকে এ দেশে জেনারালিষ্ট অফিসারদের প্রাধান্য ছিল। সরকারী প্রশাসকদের উচ্চ পর্যায়ে এসব অফিসারদের জন্য অধিকাংশ পদ সংরক্ষিত ছিলো। কিন্তু এই দুই দশকের শেষে যখন দেশে টেকনিক্যাল অফিসারদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় তখন তারা জেনারালিষ্ট অফিসারদের প্রাধান্য আরো জোরের সংগে চ্যালেঞ্জ করে বসে। যতদিন রাজনৈতিক সহায়তা জেনারালিষ্টদের স্বপক্ষে ছিলো ততদিন জেনারালিষ্টরা ক্ষমতায় টিকে ছিলো। ১৯৭০ দশকে থেকে রাজনৈতিক সহায়তা বেশ কিছুটা টেকনিক্যাল অফিসারদের অনুকূলে চলে যায় এবং এর ফলে তদানীন্তন জেনারালিষ্টদের প্রাধান্য বিলুপ্ত হয়।

২। ১৯৭০ দশকে কেন্দ্র বনাম আঞ্চলিক অর্থনীতির প্রশ্নটিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। অর্থনৈতিক উন্নতি মাত্র কয়েকটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকবে না তা আঞ্চলিক ভারসাম্য রক্ষা করবে এ প্রশ্নের উপর পাকিস্তানে ভাগ হয়ে যায়। বাংলাদেশেও বর্তমানে উন্নয়ন প্রচেষ্টায় আঞ্চলিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

৩। ১৯৭০ দশকে থেকে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ প্রশ্নটি ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। বলা হয় যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা শুধু জেনারালিষ্টদের কাছ থেকে টেকনিক্যাল অফিসারদের কাছে দিলেই চলবে না এটা সামগ্রিকভাবে সরকারী কর্মচারীদের কাছ থেকে এনে জনসাধারণের কাছে দিতে হবে। ক্ষমতার এই ধরণের বিকেন্দ্রীকরণ ছাড়া উন্নয়ন অর্থবহ হবে না। এই সব বিতর্কিত প্রশ্নে বিদেশী বিশেষজ্ঞদের খুব একটা করণীয় ছিলো না তবে বাংলাদেশ জেনারালিষ্টদের আধিপত্য এসেছিলো তার বৃটিশ উত্তরাধিকার থেকে কিন্তু এ দেশে বেশীরভাগ প্রশাসনিক বিশেষজ্ঞ এসেছিলেন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাঠামোতে জেনারালিষ্টদের আধিপত্য তুলনামূলকভাবে কম। তারা উন্নয়ন কার্যক্রমে টেকনিক্যাল অফিসারদের উপর বেশী নির্ভরশীল বলা যায়। এই সময়ই যুক্তরাজ্য ফুলটন কমিটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এ দেশে টেকনিক্যাল অফিসাররা এই রিপোর্টকে তাদের স্বপক্ষে ব্যবহারের চেষ্টা করেন কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে যুক্তরাজ্যেই ফুলটন রিপোর্ট নিয়ে দ্বিমত সৃষ্টি হওয়ায় এ প্রচেষ্টা বেশী কার্যকরী হয় নাই। যা হোক, দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমাদের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গুলিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমেরও বেশ কিছুটা পরিবর্তন ঘটে। মোটামুটিভাবে এই পরিবর্তনের ধরণ ছিলো নিম্নোরূপ :

(১) যতদিন জেনারালিষ্ট অফিসারগণ প্রশাসনের উচ্চ পর্য্যায়ে নিয়োজিত ছিল ততদিন আইনের শাসনের উপর তুলনামূলকভাবে বেশী জোর দেওয়া হতো। তখনকার প্রশাসনের মূল কথা ছিলো :-

(ক) মাঠ পর্য্যায়ে অভিজ্ঞতা ছাড়া সচিবালয়ে উচ্চ পর্য্যায়ে পদে পোষ্টিং দেওয়া হবে না। এর ফলে সচিবালয়ে যারা উচ্চ পর্য্যায়ে অধিষ্ঠিত হতো তারা মাঠ পর্য্যায়ের সমস্যার সংগে অংগাঅংগীভাবে পরিচিত থাকতো।

(খ) প্রশাসনের উচ্চপদে যারা আসীন হবেন তাদেরকে অবশ্যই ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে হাতে খড়ি নিতে হবে কারণ আইনানুগ মানসিকতা সৃষ্টি না হলে যদি কেউ উচ্চতর প্রশাসন পদে অধিষ্ঠিত হয় তবে সে প্রধানত : প্রশাসনিক (একজিকিউটিভ) মানষিকতা নিয়ে প্রশাসন পরিচালনা করতে চাইবে এবং এতে প্রশাসনে ন্যায়বিচার, সংবেদন ও ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।

(গ) জেনারালিষ্টদের অফিসারদের আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে সেই জন্যই মাঠ পর্য্যায়ের অভিজ্ঞতা ও দেশের প্রচলিত আইন বিষয়ক কার্য্যক্রম প্রাধান্য পেতো। লাহোরে অবস্থিত প্রাক্তন সিভিল সার্ভিসেস একাডেমীর প্রশিক্ষণ কার্য্যক্রম যদি পরীক্ষা করা হয় তবে দেখা যাবে আইন প্রশাসন প্রশিক্ষণ যেখানে প্রাধান্য পেতো। অবশ্য ১৯৬০ দশকের মাঝামাঝি থেকে উন্নয়ন অর্থনীতি ও উন্নয়ন প্রশাসনকেও গুরুত্ব দেওয়া হয় তবে সেই সংগে কিছুটা অলিখিতভাবে তাদেরকে আরও কয়েকটি বিষয় শেখানো হতো : প্রথমতঃ বলা হতো সে একটি ' শিকলের ' মধ্যে যদি কোন এক জায়গায় দুর্বলতা থাকে তবে পুরো শিকোলটিই অকেজো হয়ে যায় কারণ এটাকে আর ব্যবহার করা যায় না। ঠিক তেমনি প্রশাসনিক ক্যাডারের মধ্যে যদি কোন এক জন যথাযথভাবে দক্ষ না হয় তবে পুরো ক্যাডারেই দুর্বল ও অকেজো হয়ে যায়। এর অর্থ প্রশাসনিক ক্যাডারে অফিসারদের ব্যক্তিগতভাবে দক্ষ হলেই চলবে না। সমষ্টিগতভাবেও সুদক্ষ হতে হবে। দ্বিতীয়তঃ বলা হতো যে, ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় দরিদ্র জনগণ সাধারণতঃ প্রশাসনের নিকট থেকে সেবা সরবরাহ ও ন্যায় বিচার পায় না। সেই জন্য প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের বিশেষ ভাবে সচেতন হতে হয় যাতে এই সব সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতা অতিক্রম করেও দরিদ্র জনগণের উপকার করা যায়। এ কাজটি করতে প্রশাসকের পক্ষে একদিকে যেমন দেশের প্রতি আন্তরিক আনুগত্য বোধ প্রয়োজন অন্যদিকে এজন্য দরকার রাজনৈতিক ও সামাজিক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করার সৎসাহস ও দক্ষতা। এই দক্ষতাকে বৃটিশ আমলে অনেক সময় ট্যাক্ট (TACT) বলা হতো। তৃতীয়তঃ প্রশাসনিক অফিসারদের মাঠ ও সচিবালয় কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্য্যায়ে অন্যান্য ক্যাডারের অফিসারদের কাজের সমন্বয় করতে হতো এবং সাথে সাথে উন্নয়ন কার্য্যক্রমে নেতৃত্ব দিতে হতো সুতরাং নেতৃত্ব ও সমন্বয় ক্ষমতা তাদেরকে অবশ্যই অর্জন করতে হতো। এ দুটো গুনাবলীই আবার নির্ভর করতো একদিকে তাদের কর্মদক্ষতার উপর এবং অন্যদিকে নির্ভর করতো দুর্নীতি মুক্ত থাকার ক্ষমতার উপর। এ জন্যই বৃটিশ আমলে প্রশাসনিক ক্যাডারের বেতন কাঠামো এমন ধরণের হতো যাতে জীবন ধারণের জৈবিক তাড়নায় তাকে দুর্নীতির পর্য্যায়ে নেমে না আসতে হয়।

এ ছাড়াও অপেক্ষাকৃত জুনিয়ার অফিসারদের মধ্যে এই ধরণের গুনাবলী বিকাশসৃষ্টিতে প্রশাসনিক ক্যাডারের সিনিয়র অফিসারদের দায়িত্ব ছিলো অপরিসীম। এ জন্য জেলা পর্য্যায়ের কিছুসংখ্যক সিনিয়র অফিসারদেরকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বাছাই করা হতো এবং প্রশিক্ষণ একাডেমীতে জুনিয়র অফিসারদের তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ শেষ হয়ে গেলেই তাঁদেরকে এই সব সিনিয়র অফিসারদের সংগে সংযুক্ত (এটার্চ) করে দেয়া হতো যাতে তারা দৈনন্দিন কাজের মাধ্যমে জুনিয়র অফিসারদের নেতৃত্বের বিকাশ, সমন্বয় সাধন কলাকৌশল, রাজনৈতিক-সমাজতান্ত্রিক, পুঁজিবাদি সমাজব্যবস্থায় বাধ্য-বাধকতার মধ্যে জনগণের উপকার করার প্রজ্ঞা ও ট্যাক্ট এবং সর্বপরি ত্বরিৎ সমস্যা সমাধান সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নীতিমালা প্রণয়নের ব্যবহারিক কলাকৌশল রপ্ত করতে পারে।

এ সব ছাড়াও প্রশাসনিক ক্যাডারের আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কলাকৌশলের আর একটি বিশেষ দিক ছিলো লালফিতার দৌরাত্ম উত্তরণ করা। এখানে জুনিয়র ও সিনিয়র অফিসারদের মধ্যে এবং মাঠ পর্য্যায়ের ও সচিবালয় প্রশাসনের মধ্যে পার্থক্য করা হতো। মনে করা হতো, জুনিয়র অফিসাররা হবে স্বাভাবিক ভাবে অধিক গতিশীল। জনগণের কল্যাণে ঝুঁকি নেবার প্রবনতা ও তাঁদের বেশী হবে। একই ভাবে মাঠ পর্য্যায়ের অফিসাররা মাঠের সমস্যা সমাধানের জন্য ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত চাইবে এবং প্রয়োজনে নিয়মকানুন কিছু বাইরেও কাজ কর্ম হয়তো করে বসবে। এসব ক্ষেত্রে সিনিয়র অফিসারদেরকে তাঁদের নিজেদের প্রথম জীবনের অনুরূপ অভিজ্ঞতা ও প্রবনতার পরিপ্রেক্ষিতে জুনিয়রমাঠ পর্য্যায়ের অফিসারদের কাজের মূল্যায়ন করতে হবে।

প্রশাসনিক ক্যাডারের জুনিয়র ও সিনিয়র অফিসারদের কাজের মধ্যে অধিকতর সংহতি ও সমঝোতা আনয়নের জন্য প্রশাসনিক ক্যাডারে কিছু অলিখিত ব্যবহারিক মূল্যবোধ ছিলো। বৃটিশ আমলে ১০ বৎসরের কম সিনিয়র অফিসারদের 'স্যার' বলে সম্বোধন করার প্রয়োজন হতো না। পাকিস্তান আমলে এই পার্থক্য সাত বছরে নেমে আসে। তাছাড়াও নূতন স্থানে চাকুরী পেলেই প্রশাসনিক ক্যাডারের জুনিয়র অফিসারদের সিনিয়র অফিসারদের সাথে সাক্ষাৎ করতে হতো এবং সিনিয়র অফিসারদেরকে ও জুনিয়ার অফিসারদের বাড়ীতে এসে ফিরতি সাক্ষাৎ দিতে ও তাঁদের খোঁজ খবর নিতে হতো। এতে জুনিয়র ও সিনিয়র অফিসারদের মধ্যে একটা সামাজিক সম্পর্ক গড়ে উঠতো। ফলে পরবর্তী পর্য্যায়ে কার্যক্ষেত্রে যখনই কোন সমস্যা দেখা দিতো, এই সব জুনিয়র অফিসার ত্বরিৎ সমস্যা সমাধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য নথি হাতে নিয়ে সিনিয়র অফিসারদের ঘরে ঢুকে যেতে পিছ পা হতো না। এভাবে অনেক ক্ষেত্রে লালফিতার দৌরাত্ম কমানো যেতো এবং প্রশাসনের নিম্নপর্য্যায়ের প্রশাসনের উচ্চ পর্য্যায়ে থেকে সরাসরি সহায়তা পেতো।

অবশ্য একথাও ঠিক যে প্রশাসনিক ক্যাডার উপরোক্ত মূল্যবোধ ও স্টাইলের ভিত্তিতে সব সময় কাজ করে নাই। বিশেষ করে ১৯৬০ দশকের শেষ দিকে অনেক সিনিয়র অফিসারদের মধ্যে দক্ষতা ও মূল্যবোধের অভাব দেখা গেছে এবং ফলে তাদের মধ্যে জুনিয়র অফিসারদের গতিশীল নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতাও কমে গেছে তা ছাড়া রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা অনেক সময় সিনিয়র ও জুনিয়র অফিসারদের মধ্যে বিভ্রাট সৃষ্টি করেছে। এ ছাড়া কাজের সঠিক মূল্যায়ন ও ঠিক সময় প্রমোশনের সুযোগ কমে যাওয়ায় ফলে প্রশাসনিক ক্যাডারে প্রচন্ড একটা হতাশার সৃষ্টি হয়।

১৯৭০ সালের মাঝামাঝি পাকিস্তানে প্রশাসনিক ক্যাডারের প্রাধান্য বিলুপ্ত করা হয়। সেখানে সমস্ত ক্যাডার গুলিকে একত্রিত করে একটি মাত্র ক্যাডারের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং তাদের মধ্যে আর্থিক সমতা আনার জন্য বিভিন্ন বেতন স্কেল সৃষ্টি করা হয়। বাংলাদেশে অনুরূপ পদক্ষেপ

নেওয়া হয়,১৯৮০ সালের প্রথম দিকে। এ ধরণের বিবর্তনের ফলে আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পরিবর্তন ঘটে।

প্রথমতঃ প্রশিক্ষণ একাডেমীতে আইন প্রশাসনের উপর যে জোর ছিলো তা অনেকাংশে নিস্তেজ হয়ে যায়। বাংলাদেশে বহুদিন প্রশাসনিক ক্যাডারে লোক নিয়োগেও বন্ধ ছিলো। বিভিন্ন পর্যায়ে যাদের নেওয়া হয়েছিল তাদের আইন কানুন পড়ানোর উপর বিশেষ কোন জোর দেওয়া হয় নাই। ফলে প্রশাসনে আইনানুগ মানসিকতার পরিবর্তে প্রশাসনিক (একজিকিউটিভ) মানসিকতা সম্পন্ন লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এ অবস্থায় কিছুটা উন্নতি হয় উপজেলা সৃষ্টি ও সেই সংগে বেশ কিছু ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে। কিন্তু সরকারের উচ্চ পর্যায়ে আইনে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত লোকেদের সংখ্যা সম্ভবতঃ এখনও কম। আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে এই ঘাটতি মেটানোর জন্য ভবিষ্যতে পদক্ষেপ নেবার প্রয়োজন রয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় এখন টেকনিক্যাল অফিসারগণ সরকারের উচ্চতর প্রশাসনিক পদে অধিষ্ঠিত হচ্ছে কিন্তু এসব পদে নিয়োগের পূর্বে প্রাক্তন সি-এস-পি অফিসারদের যে ধরণের তাত্ত্বিক ও মাঠ পর্যায়ে লিখিত এবং অলিখিত প্রশিক্ষণ হতো (যা আমরা এই প্রবন্ধে ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি) সে গুলি টেকনিক্যাল অফিসারদের এখনও ভাল মত দেওয়া হচ্ছে না। ধরা যাক নেতৃত্ব ও সমন্বয় বিষয়ক প্রশিক্ষণের কথা। আমরা আগেই বলেছি যে এ সব প্রশিক্ষণ শুধু সার্ভিস একাডেমীতে দেওয়া হতো না, এ গুলি প্রশাসনিক ক্যাডারের অফিসারগণ তাদের সংগে সংযুক্ত (এটাচড) শিক্ষানবীস অফিসারদের অনেক যত্ন সহকারে লিখিয়ে দিতেন। এখনও যে শিক্ষানবীস অফিসারদেরকে তাদের জেলা পর্যায়ের সিনিয়র অফিসারদের দিয়ে এ ধরণের প্রশিক্ষণ দিবার চেষ্টা না হচ্ছে তা নয়। তবে এ ধরণের শিক্ষানবীস অফিসারদের সংখ্যা আগে যেখানে ছিলো বছরে ২৫-৩০ সেখানে এখন হয়েছে কয়েকশত। ফলে একজন জেলা পর্যায়ের অফিসারকে বেশ কয়েকজন শিক্ষানবীস অফিসারের দায়িত্ব নিতে হয়। তদুপরি অনেক ক্ষেত্রে তিনি নিজেই হয়তো এ ধরণের প্রশিক্ষণ পান নাই। সুতরাং তিনি তার অধঃস্তনদের নেতৃত্ব ও সমন্বয় বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেবেন কি করে?

তৃতীয়তঃ আগে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে যেখানে ১০০ জন অফিসারকে বাছাই করে বিভিন্ন সুপিরিয়র সার্ভিসে নেওয়া হতো সেখানে এখন হয়তো নেওয়া হচ্ছে প্রায় ৫০০ জন। ফলে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে প্রথম ও শেষ অফিসারদের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও শিক্ষাগত যোগ্যতার পার্থক্য অনেক বেশী দেখা যাচ্ছে। অথচ পরবর্তী পর্যায়ে অনেকসময় এদেরকে একই সংগে প্রশিক্ষণ দিতে হচ্ছে এতে প্রশিক্ষণের মান কিছু কিছু ক্ষেত্রে কমিয়ে আনতে হচ্ছে।

চতুর্থতঃ প্রাক্তন সি-এস-পি ক্যাডারের বিলুপ্তির প্রধান কারণ ছিলো যে উচ্চতর পর্যায়ে তাদের জন্য কিছু সংখ্যক পদ রিজার্ভ রাখা হতো। এ ব্যবস্থার বিরোধিতার পক্ষ থেকে বলা হতো যে এতে দক্ষতার ক্ষতি হয়। উচ্চতর পদগুলি ক্যাডারে নয় বরং মেধার ভিত্তিতে পূরণ হওয়া প্রয়োজন এবং এই মেধার ক্ষেত্রে কিছু কিছু টেকনিক্যাল অফিসার নিজেদেরকে জেনারালিস্ট অফিসারদের থেকে বেশী উপযুক্ত বলে দাবী করতেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ ধরণের প্রশাসনিক সংস্কার যখন হলো তখন দেখা গেলো যে দেশে কেবল গুটিকতক নয় ৩০টি প্রশাসনিক সাব ক্যাডার সৃষ্টি হয়ে গেছে এবং এই সব সাব ক্যাডারভুক্ত অফিসারদের জন্য নিজ নিজ ক্যাডারে

উচ্চস্তরে প্রমোশন রিজার্ভ করা হয়েছে। ফলে এসব ক্যাডারের প্রমোশনের ক্ষেত্রে একদিকে যেমন প্রমোশনের সুযোগের ভারসাম্যতা অনেক ক্ষেত্রে রক্ষা করা যায় না তেমনি নির্দিষ্ট ক্যাডারগুলিতে ক্যাডার এর বাইরের দক্ষ অফিসারদের পার্শ্বপ্রবেশ (ল্যাটারাল ইনট্রি) নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। এর ফলে এই সব ক্যাডারে অনেকক্ষেত্রে কম দক্ষ লোকের প্রমোশন পাচ্ছে। প্রশাসনের নিম্নোপর্য্যায়ে এ ধরণের ঘাটতি ততটা ক্ষতিকর না হলেও উচ্চ পর্য্যায়ের এ ধরণের ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য বিশেষ সচেতন হওয়া দরকার। যদি তা না করা হয় তবে বিশেষ ধরণের আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ সব ঘাটতি পুরণ করতে হবে।

পঞ্চমতঃ উপজেলা সৃষ্টির পূর্বে জেলা, মহকুমা ও থানা পর্য্যায়ে প্রশাসনিক ক্যাডারের অফিসাররা উন্নয়ন কার্যএম্মগুলির সমন্বয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলো। তারা একই সংগে একজিকিউটিভ অফিসার ও ম্যাজিস্ট্রেট থাকার ফলে প্রশাসনের অন্যান্য অফিসার ও জনপ্রতিনিধিগণ কিছুটা সেচ্ছায় ও কিছুটা সমীহের সাথে তাদের সমন্বয় নেতৃত্ব মেনে নিতেন। এখন প্রশাসন থেকে এম্মশঃম্যাজিস্ট্রেসী আলাদা হচ্ছে এবং জনপ্রতিনিধিকে উপজেলা পর্য্যায়ে সমন্বয়ের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। সরকারের কর্মচারীদের দায়িত্বে হচ্ছে এই নূতন ব্যবস্থা মেনে নেওয়া এবং জনপ্রতিনিধিকে তাদের দায়িত্বে পালনের সহায়তা করা। নিঃসন্দেহে এটা কঠিন কাজ এবং এ জন্য বিশেষ ধরণের আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সর্বশেষে আমরা আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে আমরা আসতে পারি। আমাদের দেশে কোন ক্যাডারে কত বেশী প্রশিক্ষণ পেলো সেটা বড় কথা নয়। কম বেশী সব ক্যাডারেই এখন বেশ কিছু প্রশিক্ষণ পাচ্ছে কিন্তু তার ফলে জনগণ সত্যিকারভাবে কতটুকু উপকৃত হচ্ছে? সাধারণভাবে বলতে গেলে আমরা দেখছি সেই বৃটিশ আমল থেকেই জনগন আমাদের জেনারালিস্ট বনাম টেকনিক্যাল অফিসারদের বিতর্ক নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামায় না তারা প্রায় সব সরকারী কর্মচারীদেরকেই আমলা বলে সনাক্তকরণের পক্ষপাতি কারণ তারা সাধারণ ভাবে সরকারী কর্মচারীদর কাছে থেকে সেবা জিনিষটি পাচ্ছেন না। বরং অনেক ক্ষেত্রে পাচ্ছেন অযোগ্যতা, দায়িত্বহীনতা, এবং বেশ কিছু ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও উদ্ধতা।

সরকারী কর্মচারীদের কি করে অধিকতর গণমুখী করা যায় তা নিয়ে প্রশাসন ব্যবস্থায় চিন্তা ভাবনা কম হয় নাই এবং বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানেই বর্তমানে প্রশিক্ষণ কার্যএম্মকে এই দৃষ্টিতে ফেলে থেকে সংস্কার করার চেষ্টা চলছে। সর্বোচ্চ পর্য্যায়ে বর্তমানে যে জাতীয় প্রশিক্ষণ কাউন্সিল রয়েছে সেখানেও এ ধরণের চিন্তা-ভাবনা চলছে ও কার্যএম্ম হাতে নেওয়া হচ্ছে। তবে এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে মারাত্মক ত্রুটি হচ্ছে যে, সরকারী কর্মচারীর একটা দৃশ্যমান কাঠামো ও সেই সংগে সেই কাঠামো চালানোর জন্য বিধিবদ্ধ নিয়মাবলী না থাকায় কাজ করতে পারে না। এটাই তাদের প্রশিক্ষণ। অথচ দেখা গেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বর্তমান কাঠামো এর নিয়মকানুনের বাধ্যবাধকতায় সাধারণতঃ দেশের সাধারণ জনসাধারণ সেবা পায় না। তাদের সেবারজন্য অনেক সময় প্রচলিত কাঠামো ও তার নিয়মকানুনের বাইরে কাজ করতে হয়। এ ভাবে কাজ করলে ঝুঁকি নিতে হয়। আমাদের নবীন অফিসারেরা হয়তো এ ধরণের কিছু ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আমাদের সিনিয়র অফিসারেরা তাদেরকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে যে কোন কারণেই হোক, তুলনামূলকভাবে অনিচ্ছুক। ফলে আমাদের উন্নয়ন প্রশাসনের সেবা মূলক কার্যএম্মে জনগণ উপকৃত হচ্ছে খুবই কম। এসব কার্যএম্মের উপকৃতরা বেশীর ভাগই হচ্ছে সমাজের অপেক্ষাকৃত উচ্চবৃত্ত শ্রেণী। এর একটি বড় উদাহরণ হচ্ছে আমাদের সমন্বিত উন্নয়ন কার্যএম্ম। কোটি কোটি টাকা খরচের পরও

আমরা দেখছি যে এসব সমিতিগুলি দরিদ্র জনগণকে যে ভাবে সাহায্য করার প্রয়োজন ছিলো তা করতে পারে নাই বরং বেশকিছু সংখ্যক মধ্যস্বত্বাধিকারী এসব সমিতির ও কার্য্যএক্সের ফায়দা লুটছে।

দরিদ্র জনগণের মধ্যে সেবা বিতরণে আমাদের অক্ষমতা আমাদের প্রশাসনিক প্রশিক্ষণের সবচেয়ে দুর্বল দিক। প্রশাসনের অন্যতম উদ্দেশ্যে যদি সমাজের দরিদ্রদের মধ্যে সেবা বিতরণ ও তাদের ভাগ্যোন্নয়ন হয় তবে বিগত কয়েক দশকে আমাদের প্রশাসন এ লক্ষ্য অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে ব্যর্থ হয়েছে বলা যায়। বিদেশী সরকার ও দাতা সংস্থা থেকে আমরা আজ পর্যন্ত কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক সাহায্য পেয়েছি। অর্থনৈতিক উন্নয়নের চমকপ্রদ মডেল এবং প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বহুসংখ্যক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও প্রশিক্ষণ মডিউলে আমরা বর্তমানে সমৃদ্ধ কিন্তু তা সত্ত্বেও বিগত বছর গুলিতে এদিকে যেমন ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বৈপরীত্য বেড়েছে অন্যদিকে দেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠির সংখ্যা ও দারিদ্রের তীব্রতা এক্সবর্ধমান হারে বেড়ে গেছে। আমাদের জাতীয় প্রবৃদ্ধি সীমিত থেকে গেছে প্রধানতঃ সমাজের উচ্চকৃত শ্রেণীদের সুযোগ সুবিধা ও আয়েশ বৃদ্ধিতে। তা হলে কি আমরা বলবো আমাদের প্রশিক্ষণ চিন্তাধারার মধ্যে কোথাও একটি রয়েছে? বস্তুতঃ প্রশিক্ষণ কার্য্যএক্সের তিনটি প্রধান দিক রয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে টেকনিক্যাল অর্থাৎ যে কাজটি করতে হবে তা কতটা দক্ষতার সংগে করা যায়। প্রশাসনের নিম্নপর্য্যায়ে এই টেকনিক্যাল দক্ষতা সবচেয়ে বেশী দরকার। প্রশাসনের মধ্যপর্য্যায়ে মানবিক সম্পর্কটি বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে কারণ মধ্য পর্যায়ের অফিসারদেরকে তাদের অধঃস্তন কর্মচারী ও সমানুরাল সহযোগী কর্মকর্তাদের সহায়তায় কাজ করতে হয়। সুতরাং আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ মধ্যপর্য্যায়ের মানবিক সম্পর্কের উপর জোর দেওয়া হয়। সবশেষে আসে প্রশাসনের তাত্ত্বিক-দিক ও ধারণাগত বিশ্লেষণ। এটি উচ্চপর্য্যায়ের কর্মকর্তাদের কঠিন দায়িত্ব। এখানে প্রশ্ন রাখতে হয় যে আমরা যে প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছি তাতে শেষ পর্যন্ত কারা উপকৃত হবে? যাদের সত্যিকারের উপকৃত হবার কথা আমাদের প্রশিক্ষণ কি সত্যি তাদের উপকার করতে পারবে?

অত্যন্ত বেদনাদায়ক হলে ও এ কথা সত্যি যে এ প্রশ্ন আমাদের কোন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানেই কার্যকরী ভাবে আলোচিত হয় না এবং এ জন্য আমাদের প্রশিক্ষণ কার্য্যএক্সও সঠিকভাবে মূল্যায়িত হয় না। সে ধরণের মূল্যায়ন অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং ফলে আমাদের প্রশিক্ষণের প্রয়োগিকদিক চিহ্নিত করে তাতে কলাকৌশল পরিবর্তনের দিক নির্দেশনা থাকে না।

শুধু সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন পর্য্যায়এক্সই নয়, অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রেই যে সরকারী কর্মচারীরা তাদের সেবামূলক কার্য্যএক্স দেশের প্রকৃত জনগণের মধ্যে পৌঁছে দিতে পারেন না তা ১৯৭৬ সালের এক প্রশিক্ষণ সমীক্ষায় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে আমাদের কাছে ধরা পড়ে। দেখা যায় প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার, কৃষি ও সেচ কার্য্যএক্স, পরিবার পরিকল্পনা কার্য্যএক্স, স্বনির্ভর উদ্যোগ ও সঠিক গ্রামোন্নয়ন কার্য্যএক্স এ সবের কোনটিতে সরকারী কর্মচারীরা গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠির কোন বিশেষ উপকার করতে পারছে না। কেন এমন হচ্ছে এর মূল প্রশাসনিক কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ১৯৭০ সালের শেষ দিকে দেখি যে (১) থানা পর্য্যায়ে জেনারালিস্ট অফিসাররা আগে যে সমন্বয় নেতৃত্ব দিতো তা প্রায় গোটাটাই ভেংগে গেছে। থানা পর্য্যায়ে টেকনিক্যাল অফিসাররা জেনারালিস্টদের নেতৃত্ব আর মেনে নিচ্ছে না এবং সেখানে অন্য কোন বিকল্প পদ্ধতির কথাও ভাবা হচ্ছে না। (২) উপরোক্ত পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই পুলিশ এবং ম্যাজিস্ট্রেসীর মধ্যেই সমঝোতা ও সমন্বয়ের অভাব দেখা দিয়েছে অথচ এই সমঝোতার উপর দেশের শান্তি শৃংখলা একান্তভাবে নির্ভরশীল। (৩) দেশে ধনতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রসারের সাথে সাথে সরকারী কর্মচারীদের মন মানষিকতায়ও এই ধনতান্ত্রিক

মূল্যবোধের প্রসার ঘটেছে। এর মূল বক্তব্য হচ্ছে নিজের স্বার্থের সাথে সংগঠনের স্বার্থের সমন্বয় হলেই সরকারী কর্মচারীরা সংগঠনের স্বার্থে কাজ করবে। যেখানে সংগঠনের স্বার্থ তার নিজের স্বার্থের পরিপুরক হচ্ছে না সেখানে সে ঐ কাজে উৎসাহ পাবেনা। বলাবাহুল্য দরিদ্র জনগণের উন্নয়ন করতে হলে সরকারী কর্মচারীরা অনেকেই নিজেরা খুব একটা উপকৃত হতে পারেন না এবং সেই জন্যই এ কাজে তারা খুব একটা আগ্রহও দেখান না।

১৯৭০ দশকের শেষ দিকে আমাদের পরবর্তী অনুসন্ধান ছিল যে দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ও সামাজিক কাঠামোর বাধ্যবাধকতার আমরা কি ধরনের প্রশাসনিক সংস্কার আনতে পারি যাতে দেশের দরিদ্র গোষ্ঠিকে আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার আওতাধীন কার্যক্রমের অন্ততঃ কিছুটা উপকার পৌঁছে দিতে পারি। এ ব্যাপারে আমাদের সমীক্ষা শেষ পর্যন্ত আমাদের কয়েকটি পথ নির্দেশ করে। এগুলি ছিলোঃ-

(১) থানা পর্য্যায়ে প্রশাসনকে উন্নত অধিকতর বিকেন্দ্রীভূত করণ এবং সেখানে প্রশাসনিক সমন্বয়ের ভার সরাসরি নির্বাচিত প্রতিনিধিকে দিয়ে দেওয়া।

(২) থানা পর্য্যায়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে উন্নয়ন কার্য্যক্রমে সংগঠিত করণ এবং অংশীদারী পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে বিকেন্দ্রীভূত ও সমন্বিত থানা প্রশাসনকে গতিশীল ও দায়িত্বশীলকরণ,

(৩) মাঠ পর্য্যায়ে উপরোক্ত প্রশাসনিক ও উন্নয়ন কার্য্যক্রমকে সচিবালয়ের কর্ম পদ্ধতির সংগে সম্পৃক্ত করণ। সচিবালয়ের প্রশাসন কাঠামো জনমুখী না হলে মাঠ পর্য্যায়ের প্রশাসন ও উন্নয়ন কার্য্যক্রম অবশ্যই জনমুখী হবে না। ১৯৮০ সালে এ ব্যাপারে আমাদের প্রশ্ন ছিলো অত্যন্ত সুস্পষ্ট [৩]ঃ

" যখন স্থানীয় জনগণ গ্রামীণ পর্য্যায়ে সংগঠিত হইবেন ও পরিকল্পনা গ্রহণ করিবেন তখন আমরা কি ইউনিয়ন, থানা ও জেলা পর্য্যায়ে এই সকল পরিকল্পনাকে সমন্বিত করিতে সমর্থ হইবো? আমরা কি পরিকল্পনার এই নিম্ন হইতে উর্ধমুখী প্রক্রিয়াকে মন্ত্রণালয়সমূহ কর্তৃক জাতীয় পর্য্যায়ে প্রস্তুত বিভিন্ন প্রকল্পের সহিত সঠিকভাবে সমন্বিত করিতে পারিব।

এই সম্পর্কে আমাদের সুপারিশ ছিল কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রশাসন ও উন্নয়ন নীতিমালা সমূহকে সমন্বিত করা। কারন ঃ[৪]

" যদি নীতিমালা সমূহকে জাতীয় পর্য্যায়ে সমন্বিত করা হয় কেবল তাহা হলেই পরিকল্পনা কার্য্যক্রমকে জাতীয় পর্য্যায়ে সমন্বিত করা যাইতে পারে, বিপরিতভাবে নহে। আর যদি জাতীয় নীতি ও পরিকল্পনাকে একত্রীভূত করা হয় তাহা হইলে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পর্য্যায়ের জারীকৃত নির্দেশনা একরূপ হইতে পারে। ইহার ফলে সচিবালয়, বিভিন্ন পর্য্যায়ে ফিল্ড প্রশাসন এবং ইউনিয়ন হইতে গ্রাম পর্যন্ত স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানগুলি কর্তৃক সমন্বিত কার্য্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে। ইহা নূতন প্রশাসনিক প্রেক্ষাপট। বাংলাদেশে এখন এই প্রেক্ষাপটের সূচনা হইয়াছে। সুতরাং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা অবশ্যই উপরোক্ত নূতন পরিস্থিতি ও প্রশাসনিক প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই জন্য আমাদিগকে নূতন ব্যবস্থাপনা/মূল্যবোধের ভিত্তিতে স্বকীয় শক্তিতে ও নিজস্ব গতিতে উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে ও প্রশাসনিক কার্য্যক্রম নূতনভাবে পরিচালিত করিতে হইবে।

সুতরাং জাতীয় পর্য্যায়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ও নীতিমালা সমন্বিত করা ও তা মাঠ পর্য্যায়ে বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসন ও উন্নয়ন কার্যএক্সমের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়াই আমাদের ভবিষ্যত প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার লক্ষ্য হওয়া উচিত। একটা নূতন অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট ছাড়া একটা নূতন প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা কার্য্যএক্স গড়ে উঠতে পারে না। আবার নূতন অর্থনৈতিক ও ব্যবস্থাপনা প্রেক্ষাপটে না থাকলে প্রশিক্ষণ কার্য্যএক্স ঘূর্নিজলে লক্ষ্যহীন ভাবে আবর্তিত হতে বাধ্য। নূতন অর্থনৈতিক ও প্রেক্ষাপটে আমাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শেখাতে পারেঃ

(১) কি করে সমাজে গতানুতিক নেতৃত্বের বাধা কাটিয়ে জনগণকে তাদের নিজস্ব সংগঠনে, সংগঠিত হতে সহায়তা করা যায়।

(২) কি করে একটি অপেক্ষাকৃত কেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক ও উন্নয়ন কাঠামোর মধ্যে ও জনগণকে সংগঠিত করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তার প্রয়োগিক ক্ষমতা জনগণের স্বপক্ষে বিকেন্দ্রীকরণ করা যায়।

(৩) কি করে প্রশাসনের মধ্যে বিচ্ছিন্ন পেশা কেন্দ্রীক দ্বন্দ্ব (যেমন জেনারালিস্ট টেকনিক্যাল অফিসারদের সংঘাত) অতিএক্স করে, পারস্পরিক আলোচনা ও যৌথমুখী কার্যএক্সমের মাধ্যমে নিজেদের উদ্বুদ্ধ ও সম্পৃক্ত করা যায় এবং কি করে চাকুরী এবং সংগঠনকে নিজের সংকীর্ণ স্বার্থ সিদ্ধির পদ সোপান হিসাবে ব্যবহার নাকরে দরিদ্র জনগণের কল্যাণ কামনায় একটা বিশুদ্ধ গতিশীল ও প্রানবন্ত জীবন অভিজ্ঞতায় পরিবর্তন করা যায়।

এভাবে আভ্যন্তুরীণ প্রশিক্ষণ কার্য্যএক্সকে বিন্যাস করতে চাইলে আমাদের প্রশিক্ষণ প্রতিস্ঠানগুলিতে যেখানে প্রধানতঃ আমরা শুধু দক্ষ সরকারী কর্মকর্তা তৈরীর চেস্টা করছি সেখানে আমাদেরকে দক্ষ সমাজকর্মী সৃস্টি করতে হবে। এই দুই প্রক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য সুস্পস্ট। দক্ষ সরকারী কর্মকর্তা নিজেকে জনগণথেকে বিচ্ছিন্ন ভাবেন এবং জনগণ তার কাছে সাহায্যের জন্য আসুক এই প্রতীক্ষা করেন। দক্ষ সমাজকর্মী জনগণের প্রজ্ঞা অনুদৃস্টি ও কর্মদক্ষতায় প্রতি অনেকবেশী শ্রদ্ধাশীল এবং জনগণের কর্মপ্রবাহ আরও বৃদ্ধি করার কাজে সাহায্য করার জন্য নিজেই জনগণের কাছে যান। এর উপরে দেশের গতানুগতিক নেতৃত্বে উন্নয়ন কার্য্যএক্সমের উপকারে দরিদ্র জনগণের নিকট পৌঁছে দিতে যেখানে বাধার সৃস্টি করে সেখানে দক্ষ সমাজকর্মী সেই বাধা বিভিন্ন কলাকৌশলে উত্তরণ করতে পারে। দক্ষ সরকারী কর্মচারীরা কাঠামোগত নিয়মকানুন ভেংগে এইধরণের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে যেতে সাধারণতঃ উৎসাহ বোধ করেন না। সেই জন্যই আমাদের মাঠ পর্য্যায়ের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি যে সব সরকারী কর্মকর্তা সমাজকর্মী মনোভাবাপন্ন ঃ-

(১) তারা মাঠ পর্য্যায়ে নিয়োজিত হলেই সম-মনা সমাজে কর্মীদের অনুসন্ধান করেন। এবং তাদের সমন্বিত করে একটা জনমুখী কর্মপ্রক্রিয়া গড়ে তোলার চেস্টা করেন।

(২) আমাদের দেশের বেসরকারী সমাজকারীদের মধ্যে যারা নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ করতে ইচ্ছুক তারাও প্রশাসন থেকে তাদের কাজে কিছুটা সাহায্য পেলে উৎসাহবোধ করেন এবং গ্রাম পর্য্যায় সেবামূলক সংগঠন গড়ে তুলে প্রশাসনকে সাহায্য করতে উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

(৩) প্রশাসনিক ও বেসরকারী প্রচেস্টার এই যৌথ উদ্দ্যোগ আরও কার্যকরী করার জন্য অনেক সময়ে স্থানীয় পর্য্যায়ে বেশকিছু ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কার্য্যএক্ম হাতে নেওয়া হয়। এ সব প্রশিক্ষণে বেসরকারী উৎসাহ ও দক্ষতা বৃদ্ধি হয় এবং সরকারী কার্যএক্ম এর সম্প্রসারণ অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে যায়। পরবর্তী পর্য্যায়ের জনগণ নিজস্ব উদ্দ্যোগ ও গতিশীলতাতেই স্থানীয় পর্য্যায়ে পরিকল্পনা তৈরী করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহ করে এবং সরকারী উদ্দ্যোগ ও উপকরণের সংগে সেগুলি সমন্বিত করণের জন্য এগিয়ে আসে। সরকারী সমাজকর্মী তখন এ উদ্দ্যোগকে কাজে লাগিয়ে একটা উন্নয়ন সমাজ প্রবাহ সৃস্টি করতে পারেন। এভাবেই সৃস্টি হতে পারে আমাদের পূর্বে উল্লেখিত নূতন অর্থনৈতিক ও ব্যবস্থাপনা প্রেক্ষাপট।

আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ প্রতিস্ঠানে যদি এ ধরণের একটা প্রশিক্ষণ প্রেক্ষাপট গড়ে তুলতে হয় তবে এসব প্রশিক্ষণ প্রতিস্ঠানে শুধু প্রশিক্ষণ কার্য্যএক্ম থাকলে চলবে না। একটা বিশেষ ধরণের প্রশিক্ষণ দর্শন ও থাকতে হবে। এই দর্শন হবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষ সমাজকর্মীতে রূপান্তর করা। অবশ্যই এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে যে সমাজে যদি ব্যাপকভাবে মূল্যবোধের অবক্ষয় হয় তবে শুধু সরকারী কর্মকর্তাদের উপর এ প্রচেস্টা কেন্দ্রীভূত করলে কি যথেস্ট হবে? আমরা সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধে সঠিক প্রচেস্টাকে অবশ্যই জোরালো সমর্থন দিচ্ছি কিন্তু এ প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ বলেই আমরা আমাদের সুপারিশ সরকারী কর্মচারীদের প্রশিক্ষণে নিবন্ধ রাখছি।

আমরা স্বীকার করছি যে, সরকারী কর্মচারীকে সমাজকর্মীতে রূপান্তরের প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণে দেওয়া যে কোন প্রশিক্ষণ প্রতিস্ঠানের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন কাজ কারণ এ ব্যাপারে কোন প্রতিস্ঠিত প্রশিক্ষণ মডিউল নেই। বিদেশ থেকে এ পর্যন্ত যে সমস্ত প্রশিক্ষণ মডিউল আমরা পেয়েছি অথবা বিদেশী অর্থনৈতিক ও ব্যবস্থাপনা ধ্যান ধারনায় প্রভাবান্বিত যে সব দেশীয় বিশেষজ্ঞ আমাদের এখানে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ 'মডিউল' তৈরী করছেন তারা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে হয়তো দক্ষ সরকারী কর্মকর্তা সৃস্টি করতে পারবেন কিন্তু দক্ষ সরকারী সমাজকর্মী তৈরী করতে পারবেন না। যদি দক্ষ সমাজকর্মী তৈরী করা আমাদের প্রশিক্ষণ দর্শন হয় তবে তার উপকরণ বিদেশে পাওয়া যাবেনা। উন্নত দেশসমূহে মূল্যবোধের অস্থিরতা আমাদের চেয়ে বেশী, কম নয়। সুতরাং আমাদের নূতন দর্শনের উপকরণ আমাদের দেশীয় সংস্কৃতি ও জীবনদর্শনের মধ্যেই খুঁজে নিতে হবে। আমরা এভাবে অগ্রসর হবো কিনা এ সিদ্ধান্ত আমাদের। তবে ১৯৮০ দশকের দ্বিতীয়ার্ধে একটা প্রচন্ড গতি প্রবাহ আমাদের গতানুগতিক অর্থনৈতিক ও ব্যবস্থাপনা ধ্যান ধারনা আমাদের দেশের সমস্যা সমাধানে করতে পারছে না এবং আমাদের দরিদ্র বিমোচন সমস্যা উত্তরোত্তর জটিলতার হচ্ছে। কাজেই নিজেদের স্বার্থেই এখন আমাদেরকে একটা বিকল্প কার্য্যএক্মের কথা ভাবতে হচ্ছে। বিগত কয়েক দশক থেকে এই গতি প্রবাহের সংগে আমরা কিছুটা পরিচিত বলেই আমরা সম্পূরক উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা প্রেক্ষাপট ও প্রশিক্ষণ দর্শনের কথা বলছি এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে দক্ষ সরকারী সমাজকর্মী সৃস্টি ও বেসরকারী নিঃস্বার্থ সমাজকর্মীদের সাথে তাদের সাংগঠনিক সংযোগ সৃস্টির কথা বলছি। এ ধরণের প্রশিক্ষণ কার্য্যএক্মকে " ক্ষমতা হস্তান্তরকরণ প্রশিক্ষণ " বলা যেতে পারে। আমাদের বর্তমান প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া আমাদের স্বপক্ষে ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে শেখায়।" ক্ষমতা হস্তান্তরকরণ " প্রশিক্ষণ তাই অবশ্যই বিভিন্ন ধরণের হতে হবে। এতে আত্ম বিশ্লেষণ ক্ষমতা,

সামাজিক দায়িত্ববোধ, দলগত ও সাংগঠনিক গতিশীলতা, অংশীদারী পরিকল্পনা তৈয়ার করার দক্ষতা ও উন্নয়ন কাজে ঝুঁকি নেবার ক্ষমতা বৃদ্ধি অনেক বেশী গুরুত্ব পায় তবে এ বিশ্লেষণে আমি আমার নিজের সীমাবদ্ধতা সবিনয়ে মেনে নিচ্ছি। আমি অর্থনীতির ছাত্র। প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনার যারা প্রশিক্ষণরত ও অভিজ্ঞ আমার বক্তব্য তাদের মনে সামান্যতম আলোড়ন সৃষ্টি করলেই আমি কৃতজ্ঞ থাকবো।

SOURCES:

১। বাংলাদেশ সুপিরিয়র সার্ভিস প্রশিক্ষার্থী অফিসারদের ষাঠ পর্য্যায়ের সমীক্ষা, নিপা এবং বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লা, ১৯৭৬।

২। **Shaikh Maqsood Ali, M. Safiur Rahman & M.K. Das, Decentralization and People's Participation in Bangladesh, 1983. NIPA + UNDP, Dhaka.**

৩। ডঃ শেখ মাকসুদ আলী, প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৮০, সংস্থাপন বিভাগ। পৃঃ ১৯

৪। ঐ, পৃঃ ২০।

দ্বিতীয় কর্ম অধিবেশন ঃ

বিষয় ঃ- আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ উন্নয়নের কৌশল ঃ

সভাপতি ঃ জনাব এ,কে,এম, হেদায়েতুল হক , রেক্টর, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা ।

প্রবন্ধ লেখকঃ ডঃ শেখ মাকসুদ আলী, সদস্য, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন ।

নির্ধারিত আলোচকবৃন্দ ঃ-

১। ডঃ এম, হারুন-উর-রশিদ,
যুগ্ম সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয় ।

২। জনাব সফিউর রহমান,
যুগ্ম সচিব,
সেচ পানি ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় ।

৩। ডঃ আলী আহম্মেদ ,
উপদেষ্টা,
ইউনেস্কো ।

৪। জনাব এম,এ, হাই ,
সদস্য ,
পাবলিক সার্ভিস কমিশন ।

অন্যান্য আলোচকবৃন্দ ঃ-

১। জনাব সৈয়দ সাইফুল ইমাম,
অনুষদ সদস্য ,
বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশিক্ষণ একাডেমী ।

২। জনাব এম এন জামান
পরিচালক,
হিসাব নিরীক্ষা ও সংরক্ষণ প্রশিক্ষণ ।

৩। জনাব মোঃ আমির হোসেন ,
সহযোগী অধ্যাপক,
স্নাতক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়,
ময়মনসিংহ ।

৪। জনাব মোঃ মুজিবুর রহমান,
পরিচালক, পরিদর্শন ও প্রশিক্ষণ (কর) ।

৫। জনাব এস,কে,জেড,ফেরদৌস ,
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী,
বগুড়া ।

৬। জনাব এম, হযরত আলী,
সহকারী অধ্যাপক,
স্নাতক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট,
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়,
ময়মনসিংহ ।

৭। ডঃ সাদেক আহমেদ

৮। বেগম নিলুফার বেগম ,
পরিচালক,
একাডেমী ফর প্লানিং এন্ড ডেভলপমেন্ট ।

প্রশ্নের জবাব প্রদান করেন ঃ-

* ডঃ শেখ মাকসুদ আলী ।

* জনাব এ,কে,এম, হেদায়েতুল হক ,
সভাপতির ভাষণ ।

ডঃ এম, হারুন-উর-রশিদ ঃ

ডঃ শেখ মাকসুদ আলীর প্রবন্ধটি অত্যন্ত সুলিখিত ও অনুদৃষ্টি সম্পন্ন এবং এটি এই কর্মশালায় অত্যন্ত সুন্দরভাবে পরিবেশন করা হয়েছে। এখানে প্রবন্ধকার প্রথমতঃ গত তিন দশকের প্রশিক্ষণের ধারা এবং এর ক্রম বিবর্তন আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। শুধু প্রশিক্ষণের ধারা ও দর্শনই নয় প্রশিক্ষণের উপাদানগুলো কি ছিল এবং সেটা বিভিন্ন পর্যায়ে কি ভাবে এবং কেন পরিবর্তিত হয়েছে এবং কি ধরণের পরিবর্তন এসেছে সেগুলোও তিনি বর্ণনা করেছেন।

প্রবন্ধকার বলেছেন যে, আমাদের বর্তমান প্রশাসন ব্যবস্থায় বিচারকের মানসিকতার অভাব রয়েছে। নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এটা অত্যন্ত জরুরী। উপরোন্তু তিনি বলেছেন যে, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে সামগ্রিকভাবে জোরালো করতে হবে। কোন একটা বিশেষ ক্যাডার বা কোন একটা বিশেষ শ্রেণীর কর্মকর্তা বা কর্মচারীগণ দক্ষ হলেই প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার সার্বিক উদ্দেশ্য সফল হবে না। তৃতীয়তঃ তিনি বলেছেন যে, নবীন অফিসারদের উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ ঘটানোর জন্য তাদেরকেনিরাপত্তা প্রদান করতে হবে। তিনি সর্বশেষে বলেছেন বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে আমাদের সমাজকে একটি উন্নত সমাজে উত্তরণ ঘটাতে হলে প্রশাসনে নিয়োজিত সকলকে সমাজকর্মী হতে হবে। আমি প্রবন্ধকারের বক্তব্যগুলোর সাথে একমত পোষন করছি, শুধু মাত্র তার সমাজকর্মীর ধ্যান ধারণা ব্যতীত।

আমরা সব সময়ই গণমুখী প্রশাসনের কথা বলে থাকি। কিন্তু এই ধারণাটির মধ্যে অস্পষ্টতা রয়েছে প্রচুর। প্রশাসনকে গণমুখী করতে যেয়ে আমরা কর্মচারী / কর্মকর্তাদের না পেরেছি গণমুখী করতে না পেরেছি দক্ষ করতে, সমাজকর্মী তো তারা নয়ই। পূর্ব থেকেই প্রশাসনের যে উদ্দেশ্য ছিল দক্ষ কর্মী সৃষ্টি সেটা করতে পারলে সমাজ কর্মী সৃষ্টির আর প্রয়োজন হয়না। কারণ, একজন প্রশাসন কর্মীর দক্ষতার সাথে সততার সাথে, আন্তরিকতার সাথে কাজ সম্পন্ন করাই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। তা করতে পারা যায় না পারিপার্শ্বিতার কারণে, আইনগত কারণে, তার উল্টো ফল সমাজে দেখা যাচ্ছে। সেজন্যই সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় পরিদৃষ্ট হচ্ছে। গণমুখী প্রশাসন এখন আমরা মুখে যতটা বলি কাজে ততটা করি না।

এটা বললে প্রতিক্রিয়াশীল মনে হবে যে , বৃটিশ এবং পাকিস্তান আমলের প্রশিক্ষণ কৌশল অনেকটা সার্বজনীন ছিল এবং তাতে অভিজ্ঞতা সিদ্ধ কৌশল ব্যবহার করা হতো । যেমন ধরা যাক - আমরা পূর্ব হতেই জানি যে, প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা এ দুটোর মধ্যে গুণগত পার্থক্য রয়েছে । শিক্ষা সাধারণত শ্রেণী কক্ষ বক্তৃতার মাধ্যমে ভাল হয় । কিন্তু প্রশিক্ষণ শ্রেণী কক্ষ বক্তৃতার মাধ্যমে সর্বোতভাবে সফল করা সম্ভব নয় । আর তার জন্য দরকার হাতে কলমে প্রশিক্ষণ, কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত তদারকী এবং অভিজ্ঞ উর্ধ্বতনদের সাথে সংযুক্তি ইত্যাদি । প্রবন্ধকার এগুলো উল্লেখ করেছেন । আমিও মনে করি এগুলোর কোন বিকল্প নেই । যুদ্ধত্তোর যুগে ক্লাশরুম ব্যবস্থায় জোর দেওয়া হয় । পূর্বে আই সি এস অফিসারদের ক্ষেত্রে সেটা খুব নগন্য ছিল । হাতে কলমে তারা মূলত শিক্ষা পেত ।

প্রবন্ধকার আইনের শিক্ষা ও আইনের প্রশাসনের উল্লেখ করেছেন । আইনের প্রশাসনের প্রতি শ্রদ্ধা কমে গেছে । আইনের প্রতি শ্রদ্ধা, জুডিসিয়াল মনন সৃষ্টি ক্ষেত্রে যে আইন শিক্ষাই [illegible] কাজ করে তা নয় , পারিপার্শ্বিকতাও তাতে প্রভাব রাখে । হাতে কলমে শিক্ষাও তাতে প্রভাব রাখে । বর্তমানে আইনের প্রতি অশ্রদ্ধার জন্য মূলতঃ সামাজিক নৈতিক অবক্ষয়ই দায়ী । এটা বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক কারণে । প্রবন্ধকার বলেছেন যে, নুতন কর্মকর্তাদেরকে তাদের উদ্ধাবনী শক্তির প্রয়োগ ঘটিয়ে নুতন নুতন ঝুকিপূর্ন কাজে হাত দিতে হবে । সেক্ষেত্রে প্রবীণ কর্মকর্তাগণ তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন । কিন্তু আমরা তা' পারিনি । শুধু প্রবীণ কর্মকর্তারাই যে নিরাপত্তা বিধান করতে সক্ষম হয় নি তাই নয় । আমাদের দেশের আইন কাঠামোতেও আমরা সেটা দিতে সক্ষম হই নি । বর্তমানকার সিদ্ধান্ত গ্রহনের শ্লথ গতি ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার অক্ষমতার কারণ পারিপার্শ্বিকতা । দেশের উচ্চতম পর্যায়ের সিদ্ধান্ত না নেওয়ার একটা প্রবণতা আমরা লক্ষ্য করি । সিদ্ধান্তটাকে আরেক জনের কাছে কি ভাবে ঠেলে দেয়া যায় তার একটা প্রবণতা রয়েছে । এটার একটা কারণ হচ্ছে এই যে, নিরাপত্তা যে শুধু নিম্নপর্যায়ে নেই তাই নয় , উচ্চ পর্যায়েও নিরাপত্তা নেই । পি ও ৯ থেকে শুরু করে এই নিরাপত্তাহীনতার অবস্থা শুরু । বিনা কারনে বা যে কোন কারনে চাকুরীবিচ্যুতির ভয় থেকে এসেছে এই ভীতি । আমি মনে করি বাংলাদেশ সৃষ্টির পর বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষমতার প্রয়োগে প্রশাসনে যে অবক্ষয়, সর্বত্র যে দুর্নীতি প্রসার লাভ করেছে তার সাথে নিরাপত্তাহীণতার বোধ অংগাঅংগীভাবে জড়িত । কাজেই আমার মনে হয়, আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত সমাজের অধিকতর সেবা ।

প্রশিক্ষণের দর্শনের মধ্যে তা থাকতে হবে । আমাদের উদ্দেশ্য হতে হবে কি করে দক্ষকর্মী, দক্ষ প্রশাসন, দক্ষ কর্মকর্তা গড়ে তোলা যায়। ব্যবহারিক জ্ঞান, ব্যক্তিগত তদারকীর মাধ্যমে দক্ষ কর্মী গড়ে তোলা দরকার যাতে প্রদত্ত দায়িত্ব তারা সার্বিকভাবে পালন করতে পারে । আমরা উন্নত দেশের দিকে তাকালে দেখতে পাব যে , সেখানে একটা বিভক্তি রয়েছে সরকারী কর্মচারীরা সমাজ কর্মী নন । সমাজ কর্মী যারা তাঁরা ব্যক্তিমালিকানাধীন সেক্টরে কাজ করেন , সেখানে থেকে সমাজ কর্মী হিসেবে একটা স্বেচ্ছামূলক সেবা দিয়ে থাকেন । কিন্তু যাঁরা সরকারী কর্মচারী তথা বুরোক্রেট তাদেরকে শেখানো হয় কি ভাবে তারা ভাল করে তাদের ভূমিকা পালন করতে পারবে । সেখানে অবশ্যই সমাজের উন্নতি করার জন্য কি দরকার, তার উপাদানগুলো কি , এগুলো সুষ্ঠুভাবে নির্ণয় করে সেই দক্ষতা অর্জন করার জন্য তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় ।সেখানে নিজের কর্মপরিধির বাইরে গিয়ে লোক জনের সেবা করা কোন সরকারী কর্মচারীর কাজ নয় ।

জনাব **শফিউর রহমান** ঃ

ডঃশেখ মাকসুদ আলীর নিবন্ধে প্রশিক্ষণের ব্যাপারে অনেক কথা বলা হয়েছে । তার জন্য অবশ্যই আমরা নিবন্ধকারকে ধন্যবাদ জানাবো । এই নিবন্ধটি পড়তে যেয়ে যে সব প্রশ্ন এসেছে আমি আজকের আলোচনায় সেই সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য রাখতে চেষ্টা করব । নিবন্ধের প্রথম অংশে তদানিন্তন সি এস পি'দের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বর্ণনা করা হয়েছে । ইতিহাস হিসেবে সেটা হয়ত কাজে লাগতে পারে কিন্তু বর্তমান প্রয়োজনের দিকে যদি আমরা লক্ষ্য রাখি তবে সে অভিজ্ঞতা খুব একটা কাজে লাগবে না । ১৯৫০ বা' ৬০ দশক এবং ১৯৮০ দশকের মধ্যে সময়ের অনেক ব্যবধান রয়েছে সমস্যার অনেক ব্যাপ্তি হয়েছে । সুতরাং তৎকালীণ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রণয়ন খুব বেশী কার্যকর হবে বলে আমার মনে হয় না । আমার মনে হয়েছে এই নিবন্ধে সরকারী কর্মকর্তাদের আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের মূল অসুবিধা কি সে সব পুরোপুরি চিহ্নিত করা হয় নি । আমার পূর্ববর্তী বক্তা ডঃ হারুন-উর-রশিদ সুন্দর ভাবে তা উল্লেখ করেছেন ।

প্রশিক্ষণের সাথে গুরুত্বপূর্ন বিষয় হচ্ছে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা। যে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে আমরা সরকারী কর্মচারী সৃষ্টি করি এবং যে শিক্ষা দিয়েছি তার উপর নির্ভর করে পরবর্তীকালে তাদেরকে আমরা কি প্রশিক্ষণ দিতে পারি। অনুরূপভাবে কি সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে তাঁরা এসেছে এটাও গুরুত্বপূর্ন। প্রশিক্ষণের একটা ভবিষ্যৎ আদর্শের কথা বলা হয়েছে কিন্তু সেই আদর্শ বাস্তবায়িত করতে হলে সবচে' বেশী দরকার বিদ্যমান প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও প্রশিক্ষকদের জন্য উন্নতি সাধন করা। এটা এই নিবন্ধে উল্লেখ করা হয় নি।

নিবন্ধের শেষেরদিকে নিবন্ধকার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী-দের দক্ষ সমাজকর্মীতে রূপান্তরিত করার কথা বলেছেন। এ ব্যাপারে ডঃ রশিদের বক্তব্যের সাথে আমি সম্পূর্নভাবে একমত। আমি শুধু এটাই পুনরায় উল্লেখ করতে চাই যে, সরকারী কর্মচারী যদি তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারে সেটাই হবে সবচে বড় লাভ এবং আমাদের প্রশিক্ষণ নীতিমালা সেভাবেই প্রণীত হওয়া উচিত। সরকারী কর্মচারীদের সমাজকর্মীতে রূপান্তরিত করার জন্য প্রশিক্ষণ নীতিমালা প্রণয়ন করা বোধ হয় সম্ভব হবে না। তবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যদি তার সামাজিক মূল্যবোধ জেগে উঠে সেটা অবশ্য একটা গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা হতে পারে। কিন্তু সেটা চূড়ান্ত আদর্শ হিসেবে হয়ত আমাদের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হবে না।

জুডিসিয়াল মানসিকতা কথা নিবন্ধে বলা হয়েছে। বর্তমান যুগের প্রয়োজন যদি আমরা লক্ষ্য রাখি তাহলে এই জুডিসিয়াল মানসিকতা কথাটার খুব একটা বেশী প্রযোজ্য হবে না। এটা নির্ভর করবে সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিবেশের উপর। জুডিসিয়াল মানসিকতা সৃষ্টি করা এবং তাকে বাস্তবায়িত করা তখনই সম্ভব হবে যখন দেশে আইনের শাসন হবে। যতদিন দেশে আইনের শাসনকে নিশ্চয়তা প্রদান করা যাচ্ছে না ততদিন আপনি সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে এটা কি ভাবে আনবেন এটা বোধগম্য নয়। নিবন্ধকার বলেছেন যে, তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে শুধু সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে যে প্রশাসনিক, প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সেখানে কর্মচারীদের সাথে বেসরকারী বা আধাসরকারী স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার কর্মচারীদেরকে যদি আলোচনায় না আনা হয় তাহলে আলোচনা সম্পূর্ন হতে পারে না।

- ৭৫ -

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কথা উল্লেখ করা যায়। তারা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কাজে নিয়োজিত রয়েছে যার সাথে এই দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠির জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং যে প্রশিক্ষণ নীতিমালা, যে প্রশিক্ষণ কলাকৌশলই আমরা তৈরী করিনা কেন, সেটা সামগ্রিকভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে প্রণয়ন করতে হবে। আলাদাভাবে করলে তা পুরোপুরি সার্থক হবে বলে আমার মনে হয় না।

এই নিবন্ধে কতকগুলি প্রেমিস ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন এক জায়গায় বলা হয়েছে দরিদ্র জনগনের দারিদ্র মোচন করার জন্য সরকারী কর্মচারীদের একটা দায়িত্ব রয়েছে। আমার মনে হয় এই বক্তব্য পুরাপুরি ঠিক নয়। কারণ, এটা নির্ভর করছে জাতীয় নীতিমালার উপর। সরকারী কর্মকর্তা আর আধা সরকারী কর্মকর্তা যারা আছেন তাদের দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের নীতি বাস্তবায়ন করা। নীতি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে হয়ত তাঁদের কর্মপন্থা অনুযায়ী এটা আসতে পারে। কিন্তু দেশের সার্বিক, সামাজিক অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিবেশের উপরে এটা নির্ভর করছে। বিচ্ছিন্নভাবে সরকারী কর্মচারীরা দেশের লোকজনের দারিদ্র দুর করতে পারে না। এটা সম্ভব নয়। এটা তাদের দায়িত্ব নয়।

আমাদের প্রধান সমস্যা কি ? প্রবন্ধকার বলেছেন আমাদের পুরাতন আইন - কানুন, চিন্তাভাবনা প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো এগুলোর পরিবর্তন দরকার। নুতনভাবে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানকল্পে তা আমরা করতে পারি নি। সে জন্যই জনগনের সমস্যার সমাধান করা যাচ্ছে না। জনগনের প্রয়োজন আমরা মিটাতে পারছি না, সেটা সচিবালয় হোক আর মাঠ পর্যায়ই হোক। আমাদের অনুসরণীয় প্রশিক্ষণ নীতিমালার কলাকৌশল উদ্ভাবন করার ক্ষেত্রে বিশেষ করে দেখা দরকার বর্তমান ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা। সেই সীমাবদ্ধতা কি ভাবে দুর করা যায় ? সেটাই প্রশিক্ষণের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

গণমুখী প্রশাসন সম্পর্কে হয়ত একটা ধারনা নিবন্ধকার এখানে দিয়েছেন। বাস্তবে প্রশাসনকে গণমুখী করার প্রয়োজন আছে কি না এবং গণমুখী প্রশাসন কতটুকু প্রয়োজন ? এ মুহূর্তে যা সম্ভব সেটা বোধ হয় আমাদের আরেকটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখা দরকার।

প্রশাসন বলতে আমরা যেটা বুঝি আমাদের চোখের সামনে যে দৃশ্য টা ভেসে উঠে তা হচ্ছে সুস্বাস্থ্যবান, মোটামুটি ভাবে প্রতিষ্ঠিত , শিক্ষিত সরকারী বা আধা সরকারী কর্মকর্তা, যাদেরকে সাধারণভাবে আমলা বলা হয়ে থাকে , যাঁরা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে অধিষ্ঠিত থাকেন । তাদের বাড়ী থাকে , গাড়ী থাকে, তাঁরা তাদের দায়িত্ব পালন করেন । এটিকে যদি গণমুখী করতে হয় তাহলে প্রয়োজন বর্তমান সামাজিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন । বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে আপনি এখন বাংলাদেশে প্রশাসনকে গণমুখী করতে পারবেন না । এই প্রসংগে শিক্ষা ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করতে হয় । আমরা আজকে যারা প্রশাসনে নিয়োজিত তাদের বেশীর ভাগই মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত থেকে এসেছি । আমাদের যে মানসিকতা তা গণমুখী প্রশাসনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় । সেটাকে যদি সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হয় তাহলে একটা অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, আমূল পরিবর্তন দরকার , সামাজিক অবস্থায়, রাজনৈতিক ব্যবস্থারও চিন্তাধারায় । সেটা বর্তমানকার দেশের প্রেক্ষাপটে সম্ভব কি না সে ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করা চলে ।

উপজেলা পদ্ধতি সৃষ্টি করে আমরা যদি মনে করি ইউ এন ও 'কে বা কয়েকটা অফিসারকে জোর করে একজন চেয়ারম্যানের অধীনে এনে আমরা প্রশাসনকে গণমুখী করে ফেলেছি বা মস্ত পদক্ষেপ নিয়েছি তাহলে ভুল করা হবে । বর্তমানে উপজেলাতে যে পদ্ধতি চলছে তার কতটুকু নিরপেক্ষ মূল্যায়ন হয়েছে ? ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে এবং নির্ভর যোগ্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য আমাদেরকে এ ধারনা দিয়েছে যে, প্রশাসন বর্তমান যেটা চলছে সেটাকে গণমুখী বলা চলে না , গণবিমুখী বলা চলে । অন্ততঃ এখন সেই ব্যবস্থাই চলছে । এর জন্য দায়ী কে , সেটা অন্য প্রশ্ন , কিন্তু এখন সেই ব্যবস্থা চলছে ।

আরেকটা গুরুত্বপূর্ন বিষয় এই নিবন্ধে উল্লেখ করা হয় নি । আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে , মাঠ পর্যায়ে যে প্রশাসন ব্যবস্থা বর্তমানে প্রচলন করা হয়েছে এটা ভালো হোক মন্দ হোক হয়েছে । কিন্তু সচিবালয়ে যে ব্যবস্থা রয়েছে সেটা কিন্তু আগের ব্যবস্থা । এখনও ঐ ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন করা হয় নি । সুতরাং আমরা সচিবালয়ের কাজ যে ভাবে ছিল সেভাবে করে যাচ্ছি ।

যে
বহু বৎসর আগে/ব্যবস্থা ছিল তার সামান্য পরিবর্তন করেছি, কিন্তু মূল দিকটা একই রয়েছে। এখন দেশের বর্তমানের প্রয়োজনের কথা লক্ষ্য রেখে সচিবালয়ের ব্যবস্থাও পরিবর্তন দরকার, সেটা হয় নি। আমাদের বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা রয়েছে, কর্পোরেশন রয়েছে কোনটাকে বলে অটোনোমাস বডি, কোনটাকে সেমি-অটোনোমাস বডি। এর কারণ কি? আমাদের দেশে প্রশাসনের কোন লক্ষ্য এখনও স্থির হয় নি তাই এই বিভিন্নতা আমাদের সামনে এখনও। যেখানে কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই সেখানে আপনি কি ভাবে একটা সুনির্দিষ্ট সমন্বিত প্রশিক্ষণ নীতিমালা তৈরী করবেন। সেটা আমি বুঝতে পারছি না।

তবে একটা জিনিষ আমরা গণমুখী করে ফেলেছি। সেটা হচ্ছে বর্তমানের নিয়োগ ব্যবস্থা। আমি আজকের সংবাদে দেখলাম যে, ৫০০ লোক'কে সিভিল সার্ভিস এডমিনিষট্রেশন-এ এ বছর নিয়োগ করা হয়েছে। এটাকে নিশ্চয়ই একটা গণমুখী ব্যবস্থা বলা চলে। কিন্তু এর প্রতিক্রিয়াটা আমাদের প্রশাসন ব্যবস্থায় কি হচ্ছে এটা আমাদের তলিয়ে দেখতে হবে। এসব কথা নিবন্ধে উল্লেখ করা হয় নি। এটা জোরেসোরে বলা উচিত। ডঃ আকবর আলী খান একটি প্রবন্ধে বলেছিলেন যে, বর্তমানে যে ভাবে নুতন কর্মকর্তা নিয়োগ করা হচ্ছে তাতে একে নূন্যতম প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা দিতে হলে আমাদের আগামী কয়েক বছর লেগে যাবে। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটা আমাদের চিন্তা করা দরকার। এটা সচিবালয়ে হোক, আর বাইরের হোক এদেরকে আপনি প্রশিক্ষণ না দিয়ে কি হচ্ছে? মাঠ পর্যায়ে ব্যবস্থা যেটা আমি বলে ছিলাম গণমুখী ব্যবস্থা আমরা প্রবর্তন করেছি এবং ক্রমান্বয়ে সেটা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। আর যেটা হয়ত এখানে আসলে ভাল হতো ন্যাশনাল ট্রেনিং কাউন্সিল বলে একটা কাউন্সিল রয়েছে। কোন এক সময় জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতির খসড়া তৈরীর সাথে আমি জড়িত ছিলাম। যে ট্রেনিং কাউন্সিল চিন্তা করেছিলাম আর যে ট্রেনিং কাউন্সিল আজকে হয়েছে তার মধ্যে কোন সাদৃশ্য আমি পাই না। সম্প্রতি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বলে একটা ড্রাফট বেরিয়েছে সেখানেও বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রশিক্ষণ নীতিমালা সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলা হয়েছে আমি তার মধ্যে কোন সারবস্তু খুজে পাই নি। দ্বিতীয়তঃ জাতীয় প্রশিক্ষণ কাউন্সিল কি কাজ করছে আমি জানি না, তার একটা সাব কমিটি করা হয়েছে। সেই সাব কমিটির ভুক্তভোগী আমি একজন। সংক্ষেপে বলতে চাই আমার এই ধারনা হয়েছে যে ন্যাশনাল ট্রেনিং কাউন্সিল করা হয়েছিল এই সমস্ত স্ট্র্যাটেজি, কলাকৌশল উদ্ভাবন করে একটা সমন্বিত প্রশিক্ষণ নীতি তৈরী করার জন্য।

সে দায়িত্ব ন্যাশনাল ট্রেনিং কাউন্সিল পালন করতে পারছেন না। বিদেশে প্রশিক্ষণে তিন জন/যাবে না চারজন যাবে, ছ'মাসের জন্য যাবে না আট মাসের জন্য যাবে এই সমস্ত বিষয় নিয়ে তারা বেশী ব্যস্ত থাকছেন। এই যদি হয় ন্যাশনাল ট্রেনিং কাউন্সিলের কাজ, তাদের কর্মের পরিধি তাহলে এই দেশের ভবিষ্যৎ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম কি হতে পারে সে সম্পর্কে আমার একটা গভীর সন্দেহ হচ্ছে। সবশেষে একটা কথা আবার বলে দিতে চাই যে, দেশের স্বাধীনতার ১১ বছর পরে শিক্ষা ব্যবস্থা কোন দিকে যাবে সেটা নিয়ে এখনও ঘুরপাক খাচ্ছি, সেই দেশে আমরা যদি বলি আমাদের প্রশিক্ষণ নীতিমালা এই হবে, আমরা গণমুখী প্রশিক্ষণ করব, আমরা সমাজ তৈরী করব, যে দেশে আইনের শাসন এখনও চলছে কি না ঘোর সন্দেহ রয়েছে, সেখানে এগুলো বলা নিতান্ত বাতুলতা ছাড়া আর কিছু হবে না।

আরেকটা বিষয় আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে যে, দেশে এখনও সামাজিক অস্থিরতা রয়েছে, তার মধ্যে আমাদের চলতে হবে। আমাদের সবার দায়িত্ব এবং সে দায়িত্ব পালন করতে গেলে অবশ্যই একটা প্রশিক্ষণ নীতিমালা তৈরী করতে হবে। এবং এই প্রশিক্ষণ নীতিমালা তৈরী করার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে যাঁরা প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন তাদের কথা স্মরণ রাখবেন এবং যেখানে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে/হবে সেই জায়গাটার কথা স্মরণ রাখতে হবে। তাদেরকে যদি আপনি ঠিকমত তৈরী না করেন তাহলে সুষ্ঠু প্রশিক্ষণ সম্ভব নয়।

ডঃ আলী আহমেদ ঃ

প্রবন্ধকার জেনারেলিষ্ট ও টেকনোএক্র্যাটদের দ্বন্দের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে তাঁদের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে তাঁরা জোরে তাঁদের অধিকার আদায়ে তৎপর হয়ে/ উঠে। বিষয়টি কি শুধু মাত্র সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য ঘটেছে, আমার জোর সন্দেহ আছে। আরেকটি ব্যাপারে তখনই লক্ষ্য করা গিয়েছিল যে, সাধারণ প্রশাসনে যে সকল কর্মকর্তাগণ জড়িত ছিলেন তাদের জন্য প্রণীত প্রশিক্ষণ যথাযোগ্য ছিলনা, তাই তাদেরকে পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। সাধারণ প্রশাসনে জড়িত আমার বন্ধুবর্গ, এমনকি প্রবন্ধকার নিজেও তার প্রমাণ; তারা তখন পি এইচ ডি সমাপন করতে গিয়েছিল।

প্রবন্ধকার তার প্রবন্ধে বলেছেন যে, প্রশাসনের উচ্চপদে যাঁরা আসীন হবেন, তাদেরকে অবশ্যই ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে হাতে খড়ি নিতে হবে, কারণ আইনানুগ মানসিকতা সৃষ্টি

উচ্চতর
না হলে কেউ যদি / প্রশাসন পদে অধিষ্ঠিত হয় তবে সে প্রথমতঃ এক্সিকিউটিভ(প্রশাসনিক) মানসিকতা নিয়ে প্রশাসন পরিচালনা করতে চাইবেন। এতে প্রশাসনে ন্যায় বিচার, সংবেদন ও ভারসাম্য বিনষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকবে। এখানে একটি বিষয়ে বিবেচনা করা দরকার ইংরেজীতে জুডিশিসাল ও জুডিসিাস দুটো শব্দ রয়েছে এবং তাদের অর্থই আলাদা। জুডিশিয়াল কর্মকর্তাবৃন্দই জুডিসিয়াস হবেন তা ঠিক নয়। তাই লেখকের মন্তব্যের সাথে আমি একমত হতে পারছি না। আমার কথা হচ্ছে 'ওয়ান সুড বি জুডিশিয়াস, ওয়ান মে নোট বি জুডিশিয়াল'।

প্রবন্ধকার জেনারেলিষ্ট ও টেকনোএ্যাটদের দ্বন্দ্বের উল্লেখ করেছেন। এবং তিনি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সেই দ্বন্দ্ব দূরীকরণের সুপারিশ রেখেছেন। আমি তার সাথে একমত। সেই সাথে আমি বলবো যে, রাজনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন সাধন ছাড়া এই ব্যাধি পুরোপুরি দূর করা সম্ভব নয়। প্রবন্ধকার সমাজকর্মীর সৃষ্টির কথা বলেছেন, এ ব্যাপারে আমার কিছুটা সন্দেহ বিদ্যমান রয়েছে। যদি একটা গণতান্ত্রিক কাঠামো/ব্যবস্থা সৃষ্টি হয় তার অধীন প্রশাসনিক ব্যবস্থার ও পরিবর্তন হবে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগত ও ক্যারিয়ারগত দ্বন্দ্ব নিরসন করা সম্ভব হবে।

প্রবন্ধকার থানা স্তরে সমন্বয়ের কথা তুলে ধরেছেন। জেনারেলিষ্ট টেকনিশিয়ানদের দ্বন্দ্বের কথা বলেছেন। আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যে, এই সমন্বয় বিষয়টিকে অনেকে অনেকভাবে দেখেন, কেউ একে নিয়ন্ত্রন (কনট্রোল) মনে করেন, কেউ একে উদ্বুদ্ধকরণ মনে করেন। আমার মনে হয় প্রশিক্ষণে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করা প্রয়োজন। লেখক আমাদের নিজস্ব, দেশজ প্রশিক্ষণ কলা কৌশল সৃষ্টির উপর জোর দিয়েছেন, আমি তার সংগে সম্পূর্ন একমত।

আমি আবারও রাজনৈতিক ব্যবস্থার গণতন্ত্রের কথা জোর দিয়ে বলতে চাচ্ছি। তার উপর কর্মকর্তাবৃন্দের ঝুকি গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি প্রভূত পরিমানে নির্ভরশীল। আমি প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সুযোগ সৃষ্টির উপরও জোর দিতে চাই। প্রশিক্ষকদের গবেষনা করতে হবে। এই প্রবন্ধে যদি এর উপর আলোকপাত করা হতো তবে প্রবন্ধটি সমৃদ্ধতর হতো বলে আমি মনে করি। পরিশেষে আমি বলতে চাই যে, রাজনৈতিক অবস্থার স্থিতিশীলতা ছাড়া, শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন ছাড়া, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি হবে না এবং প্রশিক্ষণ যথাযথ ও কার্যকর হয়ে উঠতে পারবে না।

এম, এ, হাই ঃ

প্রবন্ধকার চমৎকারভাবে তার প্রবন্ধে কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কলাকৌশলের উদ্ভাবন ও উন্নয়নের পন্থা নির্দেশ করেছেন এবং প্রশিক্ষণকে আকর্ষণীয় করে তোলার ব্যবস্থা বর্ণনা করেছেন। তিনি আমাদের প্রশিক্ষণের ইতিহাসও বিশ্লেষন করেছেন। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকারী কর্মচারীগণ আস্থার সাথে যাতে তাদের উপর বর্তিত দায়িত্ব পালন করতে পারেন তাতে সহায়তা প্রদান করা। অর্থাৎ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হচ্ছে **to generate spirit of public service.** কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে এর অভাব রয়েছে।

পূর্বেকার আমল হতে, বিশেষ করে বৃটিশ আমল যখন সাদা চামড়ার সাহেবগণ দেশ শাসন করতেন তখন হতে অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু সরকারী কর্মকর্তা ও জনগনের মধ্যে দুরত্ব কমেনি, কার্যকর যোগাযোগের অভাব রয়েছে; আগে মানুষ তাদের অভাব অভিযোগ জানিয়ে একটা সাড়া পেত, এখন তাও পায় না, বর্তমানে তারা মনে করে যে সরকারী কাজকর্মে স্থবিরতা এসে গেছে।

বর্তমান উপজেলায় গণপ্রতিনিধিগণ রয়েছেন, সরকারী কর্মকর্তাগণও রয়েছেন। তাদের মধ্যে সমন্বয়ের পরিবর্তে সংঘাত পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই সংঘাত হচ্ছে এ জন্যে যে, গণপ্রতিনিধিবর্গ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে আদেশ প্রদান করছেন এবং তাঁরা তাদের কাছ থেকে আনুগত্য চাচ্ছেন। আমার ধারণা এই সংঘাত দূরীকরণের জন্য তাদেরকে মানে গণপ্রতিনিধি ও সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দকে একসাথে প্রশিক্ষণ প্রদান করা দরকার।

পরিশেষে আমি প্রশিক্ষ-দের সুবিধাদি ও তাঁদের মানমর্যদা বৃদ্ধির উপর জোর দিতে চাই। আঞ্চলিক স্তরে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর ভৌত সুবিধাদিও বাড়ানো দরকার। প্রশিক্ষকদের গুনগত মান বৃদ্ধিও আবশ্যক।

জনাব সৈয়দ সাইফুল ইমাম ঃ

প্রবন্ধকার ডঃ শেখ মাকসুদ আলী তার প্রবন্ধে মুলধন সৃষ্টি, স্বার্থক বিনিয়োগ ও মুল্যবোধ এ তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আমরা যদি ব্যাংকিং সেক্টরের দিকে তাকাই তবে দেখতে পাব যে, মুল সমস্যাটা মুলধনের অভাবে নয়। বেশ কয়েক শ' কোটি টাকা ব্যাংকিং সেক্টরের খরচ কিন্তু এর মাত্র শতকরা একভাগ খরচ হয় প্রশিক্ষণে।

সহজেই বোধগম্য হবে যে , মূলধনের অভাবটা এখানে বড় নয়, অভাব হচ্ছে মূল্যবোধ ও দৃষ্টি ভংগির । প্রবন্ধকার তার প্রবন্ধে কর্মকর্তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার অবনতির কথা বলেছেন সেটা কি নিয়োগের ক্ষেত্রে সংখ্যাধিক্যের কারণে ঘটছে না সামগ্রিক মানোন্নতির কারণে ঘটছে ? বিষয়টি স্পষ্ট হয়া দরকার ।

এম, ন, জামান ঃ

প্রবন্ধকার তার প্রবন্ধে ক্ষমতার বিভাজনের কথা আলোচনা করেছেন । প্রশাসকদের হাতে যদি বিচার ক্ষমতা থাকে তবে তা দুর্নীতির জন্ম দিতে পারে । জনগনের দাবী হচ্ছে ক্ষমতার বিভাজন । এটা আমাদেরও লক্ষ্য । ডঃ শেখ মাকসুদ আলী একজন অর্থনীতিবিদ, তিনি প্রশাসনে সামন্তবাদ ও ধনবাদের গুরুত্বের কথা আলোচনা করেছেন । বিকল্প নির্ধারণের ক্ষেত্রে তিনি যদি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির কথা আলোচনা করতেন তবে আমরা তার সাহসিকতার পরিচয় পেতাম ।

বর্তমানে ক্যাডারে ক্যাডারে সংঘাত ভুল বোঝা বুঝি রয়েছে, সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। সেখানে সমাজসেবার কথা কতটুকু সময়োচিত ? আর সমস্যা দূরীকরণের দায়িত্বই বা কে নেবে ?

ডঃ আলী মুল্যবোধের অবক্ষয়ের কথা বলেছেন । আমি মনে করি এর অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে মুৎসুদ্দী পুঁজিবাদ আর তার কারণে লাগামহীণ ' ইনফ্লেশন ' । এই পরিস্থিতিতে একজন কর্মকর্তা কিভাবে সৎ থাকবে তার বিবেচনা করা দরকার ।প্রবন্ধকার যদি এ ব্যাপারে স্পষ্ট বক্তব্য রাখতেন তাহলে আমরা খুশী হতাম । প্রবন্ধকার বৈদেশিক সাহায্যের কথা বলেছেন । কিন্তু সেসব সাহায্য কি দেশের দরিদ্র জনগনের কোন উপকারে লেগেছে ? অর্থনীতির ছাত্র ডঃ অলী যদি সুষম বন্টনের কথা তার প্রবন্ধে উল্লেখ করতেন তবে আমরা খুশী হতাম । প্রবন্ধে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাও আলোচিত হয় নি ।

আমাদের সচিবালয়ের কাজকর্মের ধারার পরিবর্তন হয় নি , প্রশাসনে গতিশীলতা আসে নি । এখানে রাজনৈতিক দিকদর্শনের অভাবের কথা আলোচনা হয়েছে । মাছের পচন শুরু মাথা থেকে , আমাদের অবস্থাও কি তাই নয় ?

উপসংহারে বলতে চাই যে ,এখন আর বিকল্প নয়, প্রয়োজন সর্বাত্মক বিপ্লব ।

মোঃ আমির হোসেন ঃ

ইকবাল তার একটা কবিতায় লিখেছেন যে , " ঈমানের যাঁদের তাগিদ ছিল তাঁরা একরাত্রে সবাই চেষ্টা করে মসজিদ বানিয়ে ফেলেছে, কিন্তু তাতে আমার কি হয়েছে ? আমিতো পুরানো পাপী, এক বছরে মসজিদে একদিনও নামাজ পড়তে যাই নি ।" এ কবিতার উদাহরণ টেনে আমি বলতে চাচ্ছি যে, যারা আমরা প্রশিক্ষণ নিচ্ছি, তাদের প্রশিক্ষণ নেবার মানসিকতা, তাঁকে কাজে লাগানোর মানসিকতা আমাদের ভেবে দেখতে হবে । সেই সাথে প্রশিক্ষণানু নিয়োগের যথার্থতাও ভেবে দেখা দরকার । প্রশিক্ষণের ও প্রশিক্ষকদের ' ইনসেনটিভের ' কথাও ভাবা দরকার ।

ডঃ আলী তার প্রবন্ধে সমাজকর্মী সৃষ্টির কথা বলেছেন । তার প্রবন্ধে এর দিক নির্দেশনা পাওয়া যায় নি । তবে আমার ধারনা সেই পুরানো মানসিকতা, লর্ড মেকলের আকাংখিত সেই মানুষ যে শারীরিকভাবে ভারতীয়, মানসিকভাবে য়ুরোপীয়, সেই দৃষ্টি ভংগির অবসান চেয়েছেন ডঃ আলী ।

মোঃ মুজিবুর রহমান ঃ

হেগেল বলেছেন যে , The greatest lesson mankind learns from history is that he learns nothing from history '' তবুও বলবো ইতিহাসের প্রয়োজন আছে , ইতিহাস থেকে অনেক কিছু গ্রহন করার আছে । ডঃ আলী তার প্রবন্ধে সরকারী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের একটি ইতিহাস বর্ননা করেছেন, আমরা তা থেকে অনেক কিছু শিখতে পারি ।

ঔপনিবেশিক আমলের প্রশাসন ছিল বৈদেশিক শাসকদের স্বার্থে প্রণীত ।কিন্তু বর্তমান প্রশাসনের লক্ষ্য হচ্ছে গণমুখী মত। এ জন্য বর্তমান প্রশাসনে দৃষ্টি ভংগীর পরিবর্তন হয়েছে । এই পরিবর্তিত দৃষ্টি ভংগী ও গণমুখী প্রশাসনের লক্ষ্য হচ্ছে উন্নয়ন । এ উন্নয়নের লক্ষ্যে আমাদের প্রশাসনকে এমনভাবে পরিচালিত করতে হবে যাতে করে এর সুফল সকলের কাছে পৌছায় । সুবিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও নোবেল পুরুস্কার বিজয়ী গুনার মিডার তার পুস্তক এশিয়ার রংগমঞ্চে লিখেছেন ভারত পাকিস্তান সহ অন্যান্য দেশের উন্নয়নে জনগনের অংশ-গ্রহনের উপর জোর দেয়া হয়েছে । আমাদেরও সেদিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন ।

পরিশেষে আমি বলতে চাই যে , বর্তমান সমাজে ও প্রশাসনে দুর্নীতি একটি বিরাট অংশ জুড়ে আছে । সুযোগ্য প্রবন্ধকার তার প্রবন্ধে প্রশিক্ষণের দ্বারা কিভাবে প্রশাসনকে দুর্নীতি মুক্ত করা যায় এ সম্পর্কে যদি কোন নির্দেশনা দিতেন তবে প্রবন্ধটি আরো সমৃদ্ধ হতো ।

জনাব কে,জেড, ফেরদৌস ঃ

বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের উপরে , সাধারণভাবে প্রশিক্ষণের কলাকৌশল উন্নয়নের ব্যাপারে কিছু ইংগিত এ প্রবন্ধে আশা করেছিলাম । সেদিক থেকে আমরা নিরাশ হয়েছি বলা যায় ।

বগুড়ার পল্লী উন্নয়ন একাডেমী বিভিন্ন স্তরের কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে । গত বছরও এ প্রতিষ্ঠান থেকে ১৫৬৩ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে । মূল্যায়ন প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় প্রশিক্ষণ শেষে তাঁরা মাঠ পর্যায়ের কাজে আগ্রহী কিন্তু পরে দেখা যায় তাঁদের অংগীকার ঠিক থাকছে না । এখানে আমার প্রশ্ন কিভাবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ সব কর্মকর্তাদেরকে মাঠের কাজে আকৃষ্ট করা যায় ?

জনাব এম, হযরত আলী ঃ

প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে , ১৯৭০ দশকে সংখ্যাধিক্যের কারণে জেনারেলিষ্টদের প্রাধান্য বিলুপ্ত হয় । কিন্তু ডঃ আহমেদ বলেছেন সংখ্যাধিক্যের কারণে নয়, নীতিগতভাবে আমরা মেনে নেওয়ায় এটা হচ্ছে । আমার মনে হয় সংখ্যাধিক্যের কারণে হলে এটা আরোও প্রকট হয়েছে, কিন্তু বিষয়টি আমরা মেনে নিলেদ্বন্দ্বটা এখন আর থাকত না ।

প্রবন্ধকারের মতে শুধুমাত্র মধ্য পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য মানবিক দিকটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু একজন বক্তা বলেন এটা সকল স্তরেই গুরুত্বপূর্ন । আমার মতে বিষয়টা পরিস্কার হওয়া প্রয়োজন ।

ডঃ সাদেক আহমেদ ঃ

কোন প্রক্রিয়া বা সংগঠনের নিজস্ব কাঠামো এবং গতি আছে । প্রশিক্ষণেরও তা আছে । আমার মনে হয় প্রশিক্ষণের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের মধ্যে এই নির্দেশনা থাকা উচিত যে, কোন কর্মকর্তা যেন এই কাঠামোর বাইরে কোন ঝুকি না নেন ।

প্রবন্ধের শেষে আলোচনার বিষয় বস্তু সমন্ধে সংক্ষিপ্তাকারে উপসংহার থাকলে বিষয়টি আরো পরিস্কার হতো বলে আমি মনে করি ।

ডঃ শেখ মাকসুদ আলী ঃ

এই প্রবন্ধ লেখার সময় আমার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যে, যারা প্রশিক্ষণ ও প্রশাসনের ব্যাপারে অভিজ্ঞ তাদের প্রলুব্ধ করা এবং এর মাধ্যমে নিজের ধ্যান ধারনার সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা। আমার মনে হয় এ ব্যাপারে আমি সাফল্য অর্জন করেছি।

আমার প্রবন্ধে সবচেয়ে বেশী বিতর্কিত বলে যেটা আমার মনে হয়েছে সেটা হলো দক্ষ সরকারী কর্মচারী হবে, না দক্ষ সমাজকর্মী হবে। একদল বলেছেন দক্ষ প্রশিক্ষণ আমাদের সমাজে দক্ষ সরকারী কর্মকর্তা তৈরী করবে। সমাজ কর্মীর প্রশিক্ষণে আমরা যাব না। অন্যদল কলা কৌশলের কথা বলেছেন। আমি আমার প্রবন্ধে উল্লেখ করেছি এবং ষাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতাও দেখেছি যে, যে সব কর্মচারী সমাজকর্মী মনোভাবাপন্ন তারা সমমনা সমাজকর্মীদের অনুসন্ধান করে নেয়। আমি আমার প্রবন্ধে আরো উল্লেখ করেছি যে, পশ্চিমা ধ্যান ধারনা রন্ধ্রে-রন্ধ্রে ছড়িয়েছে রয়েছে। অর্থাৎ আমরা যে বিভিন্ন কলাকৌশলের কথা বলছি যেমন- স্তরবিন্যাস (Hierarchy) তদারকী, সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ এগুলো আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত যারা অনগ্রসর তাদের কাছে সেবা পৌছে দেওয়া।

আমার প্রশ্ন মানুষের জীবনের লক্ষ্য কি ?

What is the meaning and purpose of life

প্রথমে ধর্মের কথাই ধরা যাক। আল্লাহ মানুষকে দুটি কারণে সৃষ্টি করেছেন, তার একটি হলো মানুষের দায়িত্ব, আর অন্যটি হলো মানুষের প্রতি মানুষের দায়িত্ব। আপনারা বলেছেন আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালন না করলে তিনি মাফ করে দিতে পারেন, কারণ, এতে তার কিছু আসে যায় না। কিন্তু মানুষের প্রতি মানুষের যে দায়িত্ব আসে তা পালন না করলে আল্লাহ ছাড়বে না। এখন এই মানুষের প্রতি মানুষের দায়িত্বটাকে আমি যদি সমাজের অনগ্রসরদের জন্য সেবা প্রদান (service delivery) বলি তাহলে মনে হয় আমি অপরাধ করেনি। কারণ সরকারী কর্মচারী হিসেবে সেবার সুযোগ পাচ্ছি এবং সেই সংগে উপকরণও পাচ্ছি। এখানে আমার প্রশ্ন দক্ষ কর্মচারীর সেবার মনোভাব থাকলে তাকে আমি সমাজকর্মী বললে কি আমার অপরাধ হবে ?

আমার মতে সরকারী কর্মকর্তাদের রঙ দুভাগে বিভক্ত। যারা সমাজ থেকে নেয় কম, কিন্তু দেয় বেশী তারা জি (গিভার) টাইপভুক্ত। কিন্তু যারা দেওয়া থেকে নেয় বেশী তারা টি (টেকার) টাইপভুক্ত। আমার মতে পশ্চিমা দর্শন হচ্ছে টি টাইপ-ভুক্ত। তারা যত সাহায্য দেয়, তার প্রায় সিংহ ভাগই নিয়ে নেয়। তাছাড়া পশ্চিমা ধ্যান ধারনার সাথে আমাদের পার্থক্য অনেক। কাজেই আমাদের প্রশাসনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সত্ত্বার ভিত্তিতে তৈরী করা উচিত।

শিকলের কথা আমি এ জন্য উল্লেখ করেছি যে, বর্তমানে ৩০টি ক্যাডারের শিকলের মধ্যে আসন সংরক্ষিত নেই কিংবা আনুভূমিকা নিয়োগ (লেটারেল এন্ট্রি) নেই। কাজেই কোন অদক্ষ লোক যদি ক্যাডারে নিয়োগ পায় তবে ক্যাডারটা দুর্বল হয়ে যাবে। এখানে আমি যান্ত্রিক মনোভাব নিয়ে বলিনি।

পূর্বে ১০০ জন এবং বর্তমানে ৫০০ জন নিয়োগের জন্য প্রথম জন ও শেষ জনের মধ্যে মানের অবনতি হতে পারে। তবে শিক্ষা ব্যবস্থায় দেখেছি যে উপবিভাগের (টপ) শতকরা পাঁচ জন সর্ব সময়ই অসাধারণ। প্রশিক্ষণ একাডেমীতে যদি এটা সমস্যাই সৃষ্টি করে তবে এ নিয়ে চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন আছে।

আমার মতে যখন জেনারেলিষ্টরা প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে নিয়োজিত ছিল ততদিন আইনের শাসনের উপর তুলনামূলকভাবে বেশী জোর দেয়া হতো। পূর্বে ধারণা করা হতো ম্যাজিষ্ট্রেট হিসেবে মাঠ পর্যায়ে কাজ না করলে জুডিসিয়াস মন তৈরী হয় না। এ জন্য সচিবালয়ে আসার পূর্বে আইন জানা ও মাঠ পর্যায়ে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন ছিল। এখন এটা আপনারা নেবেন কি নেবেন না সেটা অন্য কথা।

আমি বিকল্প বা সমাজতন্ত্রের কথা বলিনি এজন্য যে, আমি সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্র দুটোকেই একই গ্রুপের মনে করি। আমেরিকার এক সেমিনারে একটি প্রশ্নের উত্তরে আমি জেনেছি যে, তাদের ম্যানেজমেন্ট প্যাকেজের উদ্দেশ্য হচ্ছে এন্টারপ্রাইজের দক্ষতার (এফিসিয়েন্সি) মাধ্যমে উৎপাদন বাড়ানো। এতে করে ব্যক্তিগত আয় বাড়বে এবং উন্নত কর ব্যবস্থার জন্য এর এক অংশ রাষ্ট্রের হাতে চলে যাবে। রাষ্ট্রের হাত থেকে একটা ক্রম বর্ধমান অংশ আনবিক যুদ্ধ খাতে চলে যাচ্ছে। বর্তমানে ২০ হাজার বিলিয়ন ডলারের উপরে যুদ্ধ খাতে যাচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক দেশেও উৎপাদন বাড়ানোর মাধ্যমে বাড়তি আয় রাষ্ট্রের হাতে আসছে এবং এর ক্রমবর্ধমান বাড়তি অংশ আনবিক খাতে ব্যয় হচ্ছে। কারণ, তারা ভীত এবং নিজেদের রক্ষার জন্য এটা করছে।

রোমে ' কাজের বিনিময়ে খাদ্যের কনফারেন্সে ' আমি একটি প্রশ্ন রেখেছিলাম - উন্নত দেশ আমাদেরকে যে গম দিচ্ছে তা' কিভাবে দিচ্ছে ? জাতিসংঘ থেকে বলা হয়েছে, % of the income of the developed country should be transferred for the poor, Under development Countries.

কিন্তু উন্নত দেশগুলো তাদের সংবিধানের এই অধিকার দিতে রাজী নয় কেন ? ইসলামেও ধনীদের সম্পদের উপর গরীবের অধিকার দেওয়া হয়েছে । কাজেই সমাজতন্ত্রী দেশের ও পুঁজিবাদী দেশের একই চরিত্র অবলোকনে ঐ ধরনের বিপ্লবের চিন্তা না করে টি টাইপ থেকে জি টাইপ রূপের পরিবর্তনের কথা ভাবছি । কারণ সমাজে এখনও জি টাইপের লোক আছে বলে সমাজটা এখনও এগিয়ে চলছে ।

জনাব এ,কে,এম, হেদায়েতুল হক ঃ

এখানে আমরা অনেক অভিজ্ঞতা বিনিময় করেছি এবং ডঃ শেখ মাকসুদ আলী ব্লাড গ্রুপ সম্বন্ধে আমরা সচেতন হয়েছি । ডঃ আলীর ধারনা আমরা সানন্দে গ্রহন করলাম ।

আজকের আলোচনা থেকে যে সব বিষয় বেরিয়ে এসেছে সেগুলো হচ্ছে (১) প্রশাসনের লক্ষ্য ও প্রশিক্ষণের লক্ষ্য (২) আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার অবস্থান (৩) মানসিকতার সৃষ্টি ও মূল্যবোধ (৪) সমন্বয় ও যোগাযোগ সাধন (৫) রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও তার পরিবর্তন(৬) সচিবালয়ের মানসিকতা (৭) এবং Sense of Commitment and sense of belongingness

আমি আশা করি এই সেমিনারের চিন্তার ফসল আমাদের উপকৃত করবে ।কারণ, কোন সৎ চেষ্টাই কোনদিন বৃথা যায় না । কাজেই পর্যায়ক্রমিক (incremental) ফল হিসাবে আমরা কিছুটা আশা করতে পারি

আপনাদের অনেকের মধ্যে আমি হতাশার ভাব দেখেছি । যদিও তার কোন কারণ নেই । সম্প্রতি আমি পাকিস্তান ও ফিলিপাইনে গিয়েছিলাম । সেখানেও এরকম আলোচনা হয়েছে । এখানে আমরা বলতে পারি যে, জাতির প্রশিক্ষণ কাউন্সিলকে পুণর্জীবিত করার জন্য বিপিএটিসি থেকে প্রচেষ্টার কার্পণ্য করা হবে না । আগামী ১৩ তারিখের সভায় আরো আলোচনা হবে । আশা করা যায় ডঃ আকবর আলী খানের প্রচেষ্টার সফলতা আসবে ।

৩য় কর্ম অধিবেশন ঃ

(১) জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতিমালা সম্পর্কে কিছু ভাবনা ও সুপারিশ ঃ

- ইউসুফ হায়দার

আমার মনে হয় জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতিমালা সম্পর্কে অফুরন্ত ভাবনা চিন্তা ও সুপারিশ ইতিমধ্যেই করা হয়েছে। এ সমন্ধে ভাবনা চিন্তা আর সুপারিশের যে আরো প্রয়োজনীয়তা আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে এতে মোটেই কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। আরো সন্দেহের অবকাশ নেই যে বিষয়টি খুবই জটিল। তবে মহা আনন্দের বিষয় এই যে, এক দিকে যেমন ভাবনা চিন্তা নিরন্তর চলছে, আর সুপারিশের কলেবর বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি অন্যদিকে প্রশিক্ষণ আপন মেজাজেই এগিয়ে চলেছে এবং এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভারের ভূমিকা দেশে ও বিদেশে প্রশংসা অর্জন করেছে। এ কেন্দ্রের অবদান বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের সকল সদস্যের কর্মজীবনেই প্রতিফলিত।

প্রশিক্ষণ সমন্ধে চিন্তা ভাবনার শুরুতেই যে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় সেটা হলো ঃ-

- প্রশিক্ষণের লক্ষ্য কি ? নিকট লক্ষ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী উদ্দেশ্য কি ?
- প্রশিক্ষণের পরিধি কি হবে ? এর গন্ডি কত বড় ?

লক্ষ্য ঃ-

নিকট লক্ষ্য হিসেবে প্রশিক্ষণ থেকে আমরা আশা করব যে, প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ লাভ করে যেন তার জীবনে ধারণের ক্ষমতা অর্জন করতে পারেন। শিক্ষা মানুষকে যে মূল্যবোধ দেয়, প্রশিক্ষণ সেই মূল্যবোধকে বাস্তব কর্ম জীবনে হাতে কলমে কাজে শিক্ষা দেয়।

প্রশিক্ষণের দীর্ঘ মেয়াদী উদ্দেশ্য হবে দেশের জনসাধারনের অর্থনৈতিক উন্নতি এ জন্যেই প্রশিক্ষণকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাবিকাঠি হিসেবে গণ্য করা হয়।

তদারকী ও মূল্যায়ন ঃ

জাতীয় প্রশিক্ষণের পরিধি ব্যাপক। সরকারী আধা সরকারী ও বেসরকারী সবাই এ প্রশিক্ষণের দাবীদার। এ জাতীয় প্রশিক্ষণ দানের জন্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানও বিভিন্ন ধরনের হবে, ব্যাপক হবে - সরকারী, আধাসরকারী ও বেসরকারী। এ ব্যাপকতার কারণেই জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতিমালা প্রণয়ন একটি জটিল বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার চেয়েও জটিল এ প্রশিক্ষণ মালা যদিও বা প্রণীত হয়, এর সমন্বয় সাধন করা আরো জটিল। তারপরও জটিলতা দেখা দেয় এ ধরনের প্রশিক্ষণকে তদারকী বা মনিটরিং করা এবং মূল্যায়ন করা নিয়ে।

ইন্টারেকানঃ ঃ

অসম্ভবকে সম্ভব করারও কৌশল আছে। বিভাজন নীতি অনুসরণ করলে একটি বড় বস্তুকে সহজে আয়ত্বের মধ্যে আনা যায়। এখানে দায়িত্ব বন্টনের প্রশ্ন উঠবে। প্রশিক্ষণের বন্টন নীতি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়া উচিত হবে না। কারণ এখানে দেওয়া নেওয়ার প্রশ্ন আছে। সরকারী, আধা সরকারী ও বেসরকারী সদস্যদের মধ্যে ভাবের ও কাজের আদান প্রদান বা ইন্টারএকসনের প্রয়োজন আছে। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় প্রশিক্ষণ কাউন্সিল এ কাজটি করতে পারে।

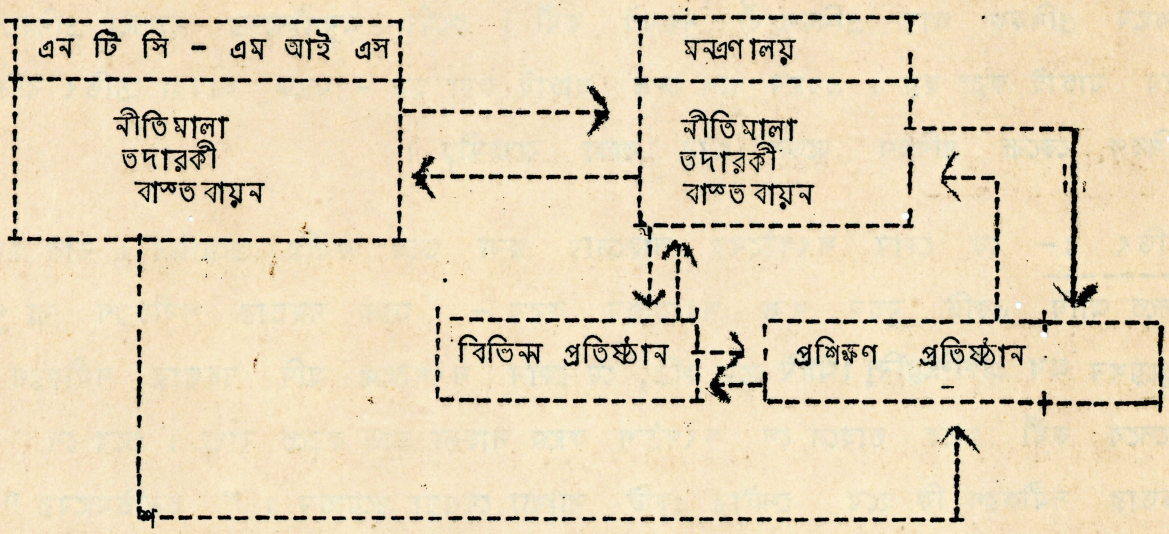
এম, আই, এস ঃ-

বর্তমান প্রযুক্তির যুগে জটিল সমস্যাকে সহজ করার একটি জনপ্রিয় উপায় প্রচলিত রয়েছে। এ উপায়টির নাম তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি- এম,আই,এস। জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতিমালা কার্যকরী করতে অথবা তদারক করতে এম,আই,এস একটি অন্যতম সহায়ক। প্রশিক্ষণ নীতিমালার উপর এম,আই,এস কেমন হতে পারে তার একটি নমুনা আমি খসড়া জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতিমালায় দিয়েছি। সেটারই একটু ব্যাখ্যা দেয়া প্রয়োজন।

এম,আই,এসটি তথ্য প্রবাহ। এ প্রবাহে তথ্য আদান প্রদান দুই-ই হয়। এ তথ্য প্রবাহের উদ্দেশ্য হলো প্রশিক্ষণ নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও তদারকী করা। জাতীয় প্রশিক্ষণ কাউন্সিলের তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এন টি সি এম, আই ,এস নামে পরিচিত হবে।

এন টি সি'র সংগে সরাসরি দ্বিমুখী তথ্য প্রবাহ স্থাপিত হবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সংগে। এন, টি,সি সরাসরি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজ তদারক করবে। মন্ত্রণালয়গুলোর সংগে সরাসরি দ্বিমুখী যোগাযোগ থাকবে তাদের নিজ নিজ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সংগে ও সংশ্লিষ্ট সরকারী, আধা সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাগুলোর সংগে।

রেখা চিত্রে এম,আই,এসটি হবে ঃ



রেখা চিত্র - ১

এম আই এস এর রেখা চিত্র থেকে কয়েকটি বিষয় পরিস্কার হওয়া প্রয়োজন। নীতিমালা প্রণয়ন, তদারকী, মুল্যায়ন ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রত্যেক ধাপে আপন আপন কর্মক্ষেত্র অনুযায়ী বর্ত্তায়। দায়িত্ব বন্টনের দুটি বড় উপকারীতা হলো এই যে, এতে (১) দায়িত্ব পালনকারীর অংশগ্রহন প্রকল্পের কর্ম তৎপরতা বাড়াবে এবং(২) ধাপে ধাপে দায়িত্ব পালনকারীর দায়িত্ব টুকু পরিস্কার ভাবে ফুটে উঠবে, সুন্দর ভাবে ফোকাস পাবে।

প্রশিক্ষণ মডেল বনাম শিক্ষা মডেল ঃ শিক্ষা মানুষকে মুল্যবোধ দেয়। আর প্রশিক্ষণ সেই মুল্যবোধকে বাস্তব কর্মজীবনে হাতে কলমে কাজে দীক্ষা দেয়। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মধ্যে সুক্ষ্ম পার্থক্যটুকু সমন্ধে আমরা অনেক সময় সচেতন থাকি না। ফলে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে আমরা শিক্ষা মডেল চালিয়ে যাই। এতে আমরা প্রশিক্ষণের লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হই। শিক্ষা অংগনে শিক্ষক আর ছাত্র পাঠ্য বই পাঠ করে। সেখানে পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার মান যাচাই করা হয়। প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্মক্ষেত্রের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। এখানে প্রশিক্ষক আর প্রশিক্ষণার্থী দুজনই কর্মী। কর্মের অনুশীলনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের মান যাচাই করা হয়। এখানে পাশ ফেল যাচাই করা হয় - যাকে আমরা গ্রেডিং বলি। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ মডেল চালু থাকা বাঞ্চনীয়।

গ্রেডিং ঃ- যে কোন সংগঠনের সাফল্যের জন্য ভাল কর্মীর প্রয়োজন। ভাল কর্মী বলতে আমি একটি নুতন শব্দ সংযোজন করব - ভাল দক্ষতার সমীকরণ বা গুড ইকুয়েশন অব এফিসিয়েন্সি। আমি মনে করি, যে কোন সংগঠণে যদি দক্ষতার সমীকরণ হিসেবে কর্মী থাকে তাহলে সে সংগঠণ কাজে সাফল্য লাভ করতে বাধ্য। তবে সে দক্ষতার সমীকরণ কি হবে সেটার একটি ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন। " চলতিমানের " কর্মীগনই কোন সংগঠনের সাফল্যের মেরুদন্ড। তাদের দক্ষতার উপরই সংগঠনের দক্ষতা বিশেষভাবে নির্ভর করে। সংগঠনের প্রতিষ্ঠার জন্য কিছু " উত্তম " মানের কর্মীরও প্রয়োজন আছে। অল্প সংখ্যক " অসাধারণ' মানের কর্মী সংগঠনের সার্বিক দক্ষতা ও সুনামের জন্যে অপরিহার্য। " চলতি মানের " উর্দ্ধে " উত্তম" ও " অসাধারন " কর্মী যেমন সংগঠনে স্থান পায় তেমনি " চলতি মানের " নীচে " নিম্ন চলতিমান" ও " নিকৃষ্ঠ " মানের কর্মীও সংগঠন থেকে বাদ দেওয়া যায় না। দক্ষতার সমীকরণ " চলতি মানের " উপর জোর দেয়। শতকরা ৫০ থেকে চলতি মানের নম্বর হিসেব করা হয়, তা হলে দক্ষতার সমীকরণে সংগঠনে মংগল হতে বাধ্য। কোন সংগঠনের জন্য গ্রহণযোগ্য গ্রেডিং এর বিতরণঃ-

অসাধারণ	১০%	৮৫% এবং উপরে নম্বর
উত্তম	২৫%	৮৪ - ৬৫% ঐ
চলতিমান	৫০%	৬৪ - ৫০% ঐ
নিম্ন চলতিমান	১৫%	৪৯ - ৩৫% ঐ
নিকৃষ্ট	৫%	৩৪% এবং নীচে নম্বর।

- ১০ -

শতকরা হিসাবে দেখা যায় যে, ১০০ জনের মধ্যে ১৫ জন কর্মী "চলতিমানের" নীচে হলেও কোন সংগঠনের দক্ষতায় তেমন বিরূপ প্রভাব পড়ে না। দক্ষতার সমীকরণ এই হিসাবে দাঁড়ায় ৬ঃ১।

প্রশিক্ষক সেইলসম্যানশীপ ঃ প্রশিক্ষণ দেওয়া সেইলসম্যানশীপের কাজ। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পরিবেশ ও প্রশিক্ষকের দক্ষতার উপর নির্ভর করে প্রশিক্ষণ গ্রহণে প্রশিক্ষণার্থীর উৎসাহ ও আগ্রহ। সাধারণতঃ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো তাদের প্রশিক্ষণ পুস্তী ও সময় সময় বিভিন্ন নির্দেশ জারী করেই প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীর অংশ গ্রহণ আশা করে। প্রশিক্ষণের বিষয় বস্তুর প্রয়োজনীয়তা কতটুকু, এটার পরিবর্তন বা পরিবর্ধন প্রয়োজন কি না সেদিকে দৃষ্টিপাত তেমন করা হয় না। ফলে প্রশিক্ষণ উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়ে। প্রশিক্ষণ যেমন মহৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রশিক্ষকও তেমনি নিবেদিত প্রান ব্যক্তিত্ব। প্রশিক্ষণকে একটি দুর্লভ পণ্য দ্রব্যের মতো বাজারজাত করতে হলে প্রশিক্ষককে হতে হবে একজন দক্ষ সেইলসম্যান। তাকে বাজারে নামতে হবে, প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করতে হবে। শুধু তাই নয়, দ্বারে দ্বারে ঘুরে প্রশিক্ষণার্থীকে আকর্ষণ করতে হবে। তাকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

লোক সম্পদ উননয়ন ঃ- প্রশিক্ষণ লোক সম্পদ উন্নয়নের প্রধান উপকরণ এবং এ ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশে সরকার পক্ষই অগ্রগামী ভূমিকা পালন করে। প্রশিক্ষণার্থীগণও তাই সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী। সরকার পক্ষ বহু প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেছে। কর্মচারী প্রশিক্ষণ, কনিষ্ট কর্মকর্তার ইনডাকশন প্রশিক্ষণ, মাঝারী কর্মকর্তার ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ, উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তার উচ্চ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। তবু দেখা যায় যে, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গুলোর মধ্যে যোগাযোগ নেই। ইন্টারএ্যাকশন নেই এবং প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু গুলোর সংগে সংগে বাস্তবতার কোন মিল নেই। প্রশিক্ষণকে বাস্তবধর্মী করার ব্যাপারে লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সাভারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। দেশের শীর্ষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে এ সব সমস্যার প্রতি আমি এ কেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যদিও বেশ কিছু বিদেশী সংস্থা আমাদের প্রশিক্ষণ প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করছে তবুও প্রশিক্ষণ একটি জাতীয় দায়িত্ব। বিদেশী সহযোগিতায় আমাদের দেশীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গুলোকে আধুনিক সাজসজ্জায় সজ্জিত করে প্রশিক্ষণে স্বয়ং সম্পূর্ন হওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য

৩য় কর্ম অধিবেশন ঃ

সভাপতিঃ এস, এম, আল হোসাইনী ।

নির্ধারিত বক্তৃবৃন্দ ঃ

১। ডঃ ফজলুল হাসান ইউসুফ,
মহা পরিচালক,
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ।

২। ডঃ এ, টি, এম, শামসুল হুদা ।

৩। জনাব আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী,
পরিচালক, (আর ডি এ) ।

৪। জনাব আমির হোসেন,
সহযোগী অধ্যাপক, গ্রাজুয়েট ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট,
ময়মনসিংহ ।

৫। জনাব এম, শামসুল হক,
যুগ্ম প্রধান,
পরিকল্পনা কমিশন ।

সাধারন আলোচনা ঃ

১। জনাব সৈয়দ সাইফুল ইমাম ।

২। জনাব এ, বি, এম, সিদ্দিক ।

৩। জনাব আনোয়ারুল হক, (নিয়েয়ার)

৪। জনাব হযরত আলী (জি, টি, আই) ।

৫। জনাব এস, এম, আল হোসাইনী, সভাপতি ।

তৃতীয় কর্ম অধিবেশন ঃ

ডঃ ফজলুল হাসান ইউসুফ ঃ

আজকের এই জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতি সংস্থাপন মন্ত্রণালয় প্রণয়ন করেছেন। এবং সে খসড়ার উপরে আজকের বিশিষ্ট উপস্থাপক যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন তার জন্য আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই। আমি মূলতঃ জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতি খসড়া রুপরেখার উপর কিছু আলোকপাত করবো। প্রথমে বলে রাখা ভাল যে, এই জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতি একটা সামগ্রিক নীতি এবং আমি সংস্থাপন মন্ত্রণালয়কে মোবারকবাদ জানাবো যে, এই প্রথম প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত চিন্তা ভাবনাগুলো যা বিক্ষিপ্ত এবং বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল সেগুলোকে সুসংহত ও সুসমন্বিত করে এক জায়গায় করা হয়েছে। যে রুপরেখা দেয়া হয় তাতে বলা হয়েছে এটা প্রধানতঃ সরকারী কর্মকর্তাদের জন্য। কিন্তু একে সার্বিক করার জন্য ব্যক্তিগত খাত ও স্বায়ত্বশাসিত খাতে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং আরো অধিকতর ব্যাপ্তিতে সমগ্র জন শক্তির প্রশিক্ষণের কথা এতে তুলে ধরা হয়েছে কিন্তু সময়ের ব্যাপ্তিতে এটা আবার সংকুচিত করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে এই নীতি পাঁচ বছরের জন্য। এ নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গুলোতে যে সমস্ত সুবিধাদি রয়েছে তার সদ্ব্যবহার করা হবে, সরকারী খাতে যে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেগুলো যাতে নিজেরাই তাদের ব্যয় নির্বাহ করতে পারে সে উদ্দেশ্যে তারা ধাবিত হবে। এ ছাড়া লক্ষ্যের মধ্যে রয়েছে দৈশিক প্রশিক্ষণকে সুসংহত করার প্রয়াসের কথা। এতে যে দর্শনের পরিচয় পাই তাতে আমরা দেখি কেরিয়ার ডেভলপমেন্ট এর সাথে প্রশিক্ষণের একটি যোগ সূত্র স্থাপনের কথা চিন্তা করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণকে কেরিয়ার ডেভলপমেন্ট-এর ইনসেনটিভ হিসেবে মনে করা হয়েছে। নীতি প্রণেতাগণ প্রশিক্ষণকে উন্নয়নের একটি উপাদান হিসেবে চিন্তা করেছেন। মানব সম্পদের বিকাশের কথা চিন্তা করেছেন। প্রশিক্ষণ চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণের নীতিমালা প্রণয়নের কথা চিন্তা করেছেন। কাজ কর্মের জন্য যে সমস্ত চাহিদা রয়েছে তা' পুরণের জন্য প্রশিক্ষণের নীতিমালা হওয়া উচিত বলে উপলব্ধি করেছেন। নীতি প্রণেতাগণ সম্পুর্নভাবে উপলব্ধি করেছেন যে, প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপণ করা প্রয়োজন। প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন, চাকুরীরত অবস্থায় প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। প্রশিক্ষণের বিভিন্ন এন,জি,ও প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাদের সম্পুরক ভুমিকা রয়েছে সে সম্পর্কেও তারা উপলব্ধি করেছেন।

তাঁরা এপেক্স ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটের কথা বলেছেন। সেই ইনষ্টিটিউটকে কেন্দ্র করে সমস্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বিস্তারিত হবে, প্রসারিত হবে। তাঁরা গ্রামীণ প্রশিক্ষণের কথা বলেছেন। তার সাথে সাথে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার কথা বলেছেন। ভকেশনাল ট্রেনিং এর কথাও তারা বলেছেন। যাঁরা কর্মরত নয়, কর্মহীন তাদের প্রশিক্ষণের কথা বলেছেন এগুলো নিরীক্ষণের ভিত্তিতে হয়েছে এবং সেই নিরীক্ষণ সংস্থাপন মনঃপ্রণালয় করেছেন। তার জন্য তাঁরা ধন্যবাদার্হ।

তারা যে নিরীক্ষণ করেছেন তাতে তারা দেখছেন যে, যে সমস্ত প্রশিক্ষণ হচ্ছে তা চাকুরী বাজারে চাহিদা অনুযায়ী নয়। এ প্রশিক্ষণগুলোর মধ্যে সুসামঞ্জস্যতা নেই। এগুলো বিক্ষিপ্ত ভাবে হচ্ছে এবং পদের পুনরাবৃত্তি ঘটছে। কোর্সের রূপরেখারও দুর্বলতা রয়েছে ল কোর্সের যে রূপরেখা রয়েছে সেগুলো যথেষ্ট গবেষনা প্রসূত নয় এবং তাদের সম্পাদনগত দক্ষতা অসন্তোষজনক এবং সর্বোপরি আমাদের সীমিত সম্পদ সত্ত্বেও আমাদের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গুলোকে পূর্ণভাবে সদ্ব্যবহার করা হচ্ছে না।

এই প্রশিক্ষণ নীতিমালায় ইমপ্লিমেন্টেশন, মনিটরিং ম্যাকানিজম-এ যে কথা বলা হয়েছে সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এন,টি,সি'র একটি মনিটরিং সেল থাকবে। এটা অত্যন্ত সময়োপযোগী, বাস্তবায়নেরও একটি সুপারিশ এতে রয়েছে। ন্যাশনাল ট্রেনিং পলিসির কথা বলতে গেলে কয়েকটা সিমেনটিকস, কয়েকটা শব্দ এসে যায়। ন্যাশনাল বলতে আমরা কি বুঝি, এর ট্রেনিং বলতে আমরা কি বুঝি ? ন্যাশনাল যেটা হবে সেটা পুরো জাতীয় জন্যই সমান হবে এবং নীতি এমন একটা জিনিষ যেটা হবে চিন্তা চেতনার উৎস। এটা চিন্তার সুযোগ দেবে, কি কাজ করবো সে ব্যাপারে নির্দেশনা দেবে। এটার যে প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য আছে সে লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারলে আমরা নীতি নির্ধারণ করতে পারবো। সংগঠনের লক্ষ্য যদি আমরা না জানি তাহলে আমরা নীতি নির্ধারণ করতে পারবো না। কাজেই প্রশিক্ষণ কাদের জন্য করছি এবং কেন করছি এবং যে সংগঠনের জন্য করছি তার লক্ষ্য কি সে সম্পর্কে আমাদের সচেতন থাকা প্রয়োজন। এটা চিন্তা করলে আমাদের আবার দেখতে হবে যে, নীতি যখন আমরা তৈরী করছি, নীতি-বাস্তবায়ন করতে গেলে তার কি কি প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, সে প্রতিবন্ধকতাগুলো সম্পর্কে আমাদের ওয়াকেবহাল সজাগ এবং সচেতন থাকতে হবে।

যেহেতু আমরা সমস্ত জাতির জন্য এ প্রশিক্ষণের কথা চিন্তা করছি, আমাদের জানতে হবে যে, আমাদের জাতীয় লক্ষ্য কি ? এবং সেই লক্ষ্যের ভিত্তিতেই আমাদের প্রশিক্ষণের লক্ষ্য নির্ধারণ হওয়া প্রয়োজন । যেমন, ধরুন জাতীয় লক্ষ্য হতে পারে ঃ আমাদের ভূখন্ডগত সংহতি রক্ষা করা আমাদের জনসাধারণের জীবনধারণের উৎকর্ষতা বিধান করা । এগুলো আমাদের জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতিতে প্রতিফলিত হতে পারে । এটা প্রতিফলিত হলেই আমরা বলবো যে, এটা একটা জাতীয় নীতি ।

এই প্রশিক্ষণ হস্তক্ষেপের ইন্টারভেনশন প্রয়োজন কে তার সংগে দেখতে হবে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যটা কি ? প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হলো যে, যে কোন সংগঠনের কর্মকর্ত/কর্মচারীদের নিয়ত যে দায়িত্ব রয়েছে সে দায়িত্ব সম্পাদন করতে তাদের যা করা উচিত তার জন্য তাঁদের প্রস্তুত করা , এবং শুধু প্রস্তুত করা নয়, তাদের ভালভাবে কাজ করার জন্য এবং তাদের বিকশিত করা এবং প্রশিক্ষণের লক্ষ্য সাধনে উদ্বুদ্ধ করা । এটা হলো প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য । কাজেই আমাদের জাতীয় প্রশিক্ষণের নীতিতে যা বিবৃত হয়েছে, তার ক্ষেত্রে আমরা বিচার করবো আমাদের নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানিক লক্ষ্য এবং জাতীয় লক্ষ্য কতটা এ নীতিতে প্রতিফলিত হয়েছে ।

এখানে বিচার করতে হবে চাহিদা কেন ? এ চাহিদাগুলো বিভিন্ন পারস্পারিকভাবে সংযুক্ত উপাদানের জন্য হয়ে থাকে । দেশে এখন কার উন্নয়ন প্রক্রিয়ার জন্য একটা নতুন ধরনের চাহিদা রয়েছে । সরকারী কর্মকর্তাদের এলিটধর্মী কাঠামো ছিল , আজকে তা কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ বিবেচনা করতে হবে । আমাদের ইনপুট সরবরাহের যে পদ্ধতি রয়েছে তার জন্য আমাদের প্রশিক্ষণ গুলো যথোপযুক্ত কি না, ফলপ্রসূ কি না, এটা আমাদের বিবেচনা করা দরকার । সেটার জন্য আমরা কি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রেখেছি ? এটা আমাদের চিন্তা করতে হবে । তেমনি প্রশিক্ষণ নীতি কাঠামো কে বাদ দিয়ে হতে পারে না । কাজেই সেই প্রশাসনিক কাঠামোকে সমন্বিত করতে হলে এবং সকল প্রশাসনের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা সকলের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হলে আমাদের বর্তমান প্রশিক্ষণ কতদূর কার্যকর তা খতিয়ে দেখতে হবে ।

এসব চিন্তাভবনা এই প্রশিক্ষণ নীতির খসড়ায় আছে, এবং প্রতিফলিতও হয়েছে । তবে আমার মনে হয় যেহেতু সুপারিশটি খসড়া এটা যখন চূড়ান্ত করা হবে তখন এটাকে ক্রমানুসারিক করলে ভাল হয় । এ প্রশিক্ষণ নীতিতে আমার মনে হয়েছে একটা সুনির্দিষ্ট নিক্ষেপন বা ফোকাসের অভাব রয়েছে । প্রশিক্ষণ দর্শনটা আরও প্রস্ফুটিত হলে এটা একটা চমৎকার এবং অগ্রগামী কাজ হবে ।

বাংলাদেশে এর আগে এমন কাজ আর হয়নি এবং এটা আরোও ভাল হবে যদি আমাদের জাতীয় দর্শন, প্রশিক্ষণ দর্শন, প্রতিফলিত করতে পারি আমাদের এ প্রশিক্ষণ নীতির মধ্যে। এবং এখানে আমি সংবিধানের ধারার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। কারণ জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতির একটা প্রতিষ্ঠানিক ভিত্তি থাকা দরকার। জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতির সাংবিধানিক ভিত্তি দ্বারা এটাকে ব্যাখা করা যায়। সংবিধানে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য কর্মসংস্থান করা। জনসাধারণেরও কর্মের দায়িত্ব ও অধিকার রয়েছে। সংবিধানে বলা হয়েছে পেশা ও কর্মের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, তাদের যেমন অধিকার রয়েছে তেমনি কর্তব্যও রয়েছে। সরকারী কর্মচারীদের সার্বক্ষণিক দায়িত্ব রয়েছে জনগণের জন্য কাজ করা। প্রশ্ন আসে দক্ষতা বাড়ানের, এ দক্ষতা বাড়াতে গেলেই প্রশিক্ষণের প্রয়োজন এবং প্রশিক্ষণের দর্শন সেখানেই নিহিত রয়েছে। আমার মনে হয়, আমরা যদি এগুলো প্রশিক্ষণে নীতিমালার মধ্যে আনি তাহলে এটা আরোও সার্বিক রুপ নেবে, জাতীয় দৃষ্টি ভংগি দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টি ভংগি পাবে। এটা দার্শনিক রুপ নেবে। শেষে সংস্থাপন মন্ত্রালয়কে মোবারকবাদ জানাচ্ছি সংগে সংগে বিনীত নিবেদন রাখবো যে, যেহেতু একটি অগ্রগামী কাজ এ কাজটা যেন আরও দার্শনিক রুপ নেয় আরও দীর্ঘয়েয়াদী দৃষ্টিভংগি লাভ করে। এভাবে যদি চুড়ান্ত করা হয় তাহলে সমগ্র জাতি উপকৃত হবে। ধন্যবাদ।

ডঃ এ,টি,এম, শামসুল হুদা ঃ

সুধী বৃন্দ, জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতি সম্পর্কে ৭ মিনিটে আলোচনা করা অত্যন্ত দুরুহকাজ। তবু আমি এ সময়ের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করব। আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলে গেছেন যে, ন্যাশনাল ট্রেনিং পলিশির টার্ম তিনটির ব্যাখ্যা প্রয়োজন। ন্যাশনাল মানে জাতীয় পর্যায় এবং আমি মনে করি যে, এখানে একটা স্তরভেদ আছে, হাইয়ারার্কি আছে, অর্থাৎ ন্যাশনাল যখন বলা হচ্ছে তখন লোকাল লেভেল কিছু পলিসি থাকবে যেটা কি না ন্যাশনাল ট্রেনিং পলিসির সংগে সামঞ্জস্যপুর্ন হবে। সেভাবেই ন্যাশনাল কথাটা আসছে বলে আমি মনে করি। ট্রেনিং সম্পর্কে উপস্থাপক যথার্থই বলেছেন যে, শিক্ষার সাথে এর একটু পার্থক্য আছে। সেটা আমাদের বুঝার প্রয়োজন আছে। পলিসি হচ্ছে নীতি নির্দেশনা। যে বিষয় বস্তুতে কিংবা যে দলিলে দিক নির্দেশনা থাকে সেটাই নীতি।

সুতরাং এ খসড়াটি যদি আমাদের ন্যাশনাল ট্রেনিং পলিসি বলি তাহলে দেখতে হবে ন্যাশনাল ট্রেনিং পলিসির বাইরের কোন বিষয় এটাতে ঢুকে পড়েছে কি না। অথবা যেটা ন্যাশনাল যেটা ট্রেনিং অথবা পলিসি সম্পর্কিত সে ধরনের কোন জিনিষ বাদ পড়েছে কি না। প্রথমে আমি সংস্থাপন মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় প্রশিক্ষণ কাউন্সিলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে, তাঁরা একটা বিরাট কাজ হাতে নিয়েছিলেন এবং মোটামুটি একটা প্রাথমিক পর্যায়ের খসড়া পর্যন্ত উপণীত হয়েছেন। এটা একটা দুরূহ কাজ। এজন্য যারা এ খসড়া প্রণয়নের সংগে জড়িত ছিলেন তারা সকলেই আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। যেহেতু সময় কম আমার মনে হয় যে, আমার যেগুলো বলা উচিত যেখানে আমি খসড়ার সাথে ব্যক্তিগতভাবে একমত হতে পারছি না, এ সুযোগে আমার মনে হয় সেগুলো উল্লেখ করা দরকার।

আমার মনে হয়েছে যে, প্রথম পলিসি হয়, তারপরে প্রোগ্রাম, তার পর হয় প্ল্যান অথবা প্রোগ্রাম বা প্রজেক্ট। খসড়াটি পড়তে গিয়ে মনে হয়েছে যে, ঠিক নীতি নির্ধারণের স্তর উত্তরণ করে অনেক জায়গাতেই নির্বাহী কার্যএক্সের মধ্যে চলে যাওয়া হয়েছে এবং সেই কারণে এন টি সি'র ভূমিকা কি, সেটা কিন্তু অস্পষ্ট হয়ে গেছে। যাহোক, এখানে দেখা যাচ্ছে যে, এন টি সি'র কতগুলো ভূমিকার কথা বলা হয়েছে যেগুলো নির্বাহী প্রকৃতির কাজ। যেমন বলা হয়েছে যে, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে এনটিসি মনিটর করবেন যেমন পি এ টি সি'র কোর্স ডিজাইন। সে কোর্স ডিজাইন কতটা স্বার্থক কতটা ফলপ্রসু সেটাও মনিটর করার দায়িত্ব এন টি সি হাতে নিয়েছে। এটা তো একটা তদারকির কাজ হলো। এন টি সি একটা উচ্চ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান; এটা কেন্দ্রীয় সমন্বয় ও নীতি নির্দেশনা দেবে। সেখান থেকে অনেক নীচে নেমে তদারকির কাজে যাচ্ছে। পেশাধারী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গুলো দুনিয়ার যে কোন জায়গাতে তার স্বায়ত্বশাসন সম্পর্কে ভীষনভাবে আগ্রহী। যারা বিষয় বিশেষজ্ঞ তাঁরা যে কোর্স ডিজাইন করবে তা তদারক করার জন্য এনটিসি হতে কারা আসবেন? তাদের পরিচয় কি, তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কি, তাদের একাডেমিক পারফরমেন্স কি? বারে বারে বলা হয়েছে যে, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে পেশাধারী হতে হবে। সুতরাং এক পেশার জিনিষকে আরেক পেশার লোক হয়ত মূল্যায়ন করতে পারবেন। কিন্তু এন টি সিতে সে ব্যবস্থা করা হবে কি না সেটা বলা নেই। এজন্য সমস্যা হতে পারে। কারণ এখানে বিরোধের সম্ভাবনা আছে। এবং তাতে অসুবিধা সৃষ্টি হতে পারে।

একই ভাবে আরেকটা পরস্পর বিরোধিতা দেখতে পাচ্ছি। এখানে বলা হচ্ছে যে, প্রাইভেট সেক্টরে আমরা প্রভূতভাবে সর্বানুকরণে সাহায্য করবো। তাতে প্রাইভেট সেক্টরে ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট গড়ে উঠবে। আবার বলা হচ্ছে কোন নুতন ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট প্রাইভেট অথবা পাবলিক এনটিসির ছাড়পত্র ব্যতীত করা যাবে না। প্রাইভেট সেক্টর তো এতো বাধা বিপত্তির মধ্যে গড়ে উঠতে পারে না। কারণ প্রাইভেট সেক্টরকে অবাধ প্রবাহের মধ্যে রাখতে হবে। প্রাইভেট সেক্টর তার নিজের বিশ্লেষণ, নিজের ... প্রয়োজন বোধে যা দরকার সেটা করবে। আপনি সেখানে নির্দেশনা দিতে পারেন। কিন্তু ছাড়পত্রের বিষয়টি এটাকে বাধাগ্রস্থ করতে পারে। যেটা এনটিসি মনিটর করতে পারে সেটা হলো বৃহৎ নির্দেশনা। যে কোর্সগুলো করতে বলা হয়েছে সে কোর্স গুলো করা হয়েছে কিনা। কতজন প্রশিক্ষণার্থীর পাওয়ার কথা ছিল, কতজন এসেছে ? তাদের যেভাবে মূল্যায়ন করার কথাছিল, সেভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে কিনা ? এগুলো হয়তো তারা দেখতে পারে। কারণ এনটিসিকে শুধু বিপিএটিসি পরিচালনা করলে হবেনা। যে ১৫০ টি বা ২৫০টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান আছে এগুলোর তদারকির জন্য এনটিসির লোকবল কোথায় ?

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, যাঁরা এ সমস্ত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা হবেন তাদের যে একটা পেশাধারী অধিকার এবং কাজ করার স্পৃহা রয়েছে সেটা কিভাবে আসবে ? সেটা আমার কাছে পারস্পর বিরোধী মনে হয়েছে। সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বলা হচ্ছে তারা নিজেরাই নিজের অর্থ সংস্থান করবে। সেটা করারপন্থাও এখানে বলা হয়েছে, পরামর্শদান ও গবেষণার মাধ্যমে তা করা হবে। আমি খুব ভয় পাচ্ছি যে, যদি এ সিস্টেম করা হয় তাহলে কিন্তু লোকজন ট্রেনিং করবেন না। ঐ পরামর্শদান ও গবেষণার মধ্যে তারা ব্যস্ত থাকবে এবং এটা পরামর্শদান, ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে পর্যবসিত হবে। টেনিংয়ের কাজ আর হবে না। তারা সবাই বিদেশী সংস্থা, এশিয়া ফাউন্ডেশন ফোর্ড ফাউন্ডেশন এদের পিছনে ঘুরাফেরা করে সময় নষ্ট করবে। ট্রেনিংয়ের মত গুরুত্ব বিষয়ে আমাদের 'সেল্ফ ফাইন্যান্সিং' -এর কি প্রয়োজন আছে ? এমনকি প্রাইভেট সেক্টরের হোতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কোরিয়ার এক্সিকিউটিভদের ট্রেনিং এই সিস্টেমে হয় না। যুক্তরাজ্যের থ্যাচার গভর্ণমেন্ট এখন আমেরিকাকেও ছড়িয়ে যেতে চাচ্ছে। প্রাইভেট সেক্টরের মধ্যে সেখানেও প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ নিজেদের অর্থে যোগানের ভিত্তিতে হয় না। আমরা এখানে কেন এটা করতে যাচ্ছি।

আপনারা যদি চান যে, উপদেশনা এবং গবেষণার মাধ্যমে অর্থ যোগান হবে তাহলে আরেকটা বাধা ট্রেনিং কাউন্সিলের মধ্যে বলা আছে। বলা হচ্ছে যে, এই সমস্ত সরকারী প্রতিষ্ঠানে যাঁরা প্রেষণে নিয়োজিত হবেন তারাই শুধু মাত্র ট্রেনিং ভাতা পাবেন। পরামর্শদানের জন্য সম্মানী পাবেন না। তাহলে যারা কাজ করবেন তারা কোন রকম আর্থিক সুবিধা না পেয়ে কেন উপদেশনা ও গবেষণা করবেন ? তাহলে এ কাজ করার জন্য অসংখ্য আওগার হামিদ খানের মত লোক দরকার হবে যাদের জাগতিক কোন ইচ্ছা বাসনা নেই, যাঁরা সবকিছু করে প্রতিষ্ঠানের টাকা পয়সা জোগাড় করার জন্য খেটে খুটে গবেষনা করবেন কিন্তু তার মধ্যে তিনি কিছু পাবেন না।

আরেকটা সমস্যা, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে যাঁরা প্রশিক্ষক তাদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে, তাদেরকে অত্যন্ত উচ্চমানের পেশাদারী হতে হবে। এটা নিশ্চিত করার জন্য একটা পন্থা বলা হয়েছে যে, নিয়োগ বিধিতে এমন ব্যবস্থা থাকতে হবে যেন যোগ্য ব্যক্তি ছাড়া কেউ আসতে না পারে। কিন্তু এখানেও একটা বিরোধিতা আছে। আমাদের বিপিএটিসি নিয়োগ বিধি অনুসারে যোগ্য লোক নিয়োগ করা হয়। কিন্তু প্রেষণে যখন আসে তখন কিন্তু এটা দেখা হয় না। যারা সরকারের শাখা প্রধান বা উপ-সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা তারা এখানে নিয়োজিত হন। আমার শুন্য পদ হচ্ছে আচরণ বিজ্ঞান, যেখানে মনোবিজ্ঞানে এম, এস, ডিগ্রী প্রয়োজন। কারন তাকে এসব ক্লাশ নিতে হবে। সে জায়গায় আরবীতে এম,এ, পাশ লোককে প্রেষণে পাঠান। সুতরাং শুধু সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রেই এটা করলে চলবে না, যাঁরা প্রেষণে আসবেন তাদের ক্ষেত্রেও আমাদের প্রশিক্ষণের কি প্রয়োজন সেটা সরকারকে দেখতে হবে। কিন্তু এখানে আমার তিন বছরের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে, সরকারই জিনিষটা আমলে নিচ্ছে না। যখন হাতের কাছে যাকে পাচ্ছেন, তাকেই এখানে বদলী করে দেয়া হচ্ছে। সুতরাং সেদিক দিয়েও বোধ হয় আরো দেখার প্রয়োজন আছে।

প্রশিক্ষণ নীতি এমন একটা দলিল যেটা ভবিষ্যতের নীতি নির্ধারণে সহায়তা করবে। অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যে, বাংলাদেশের সব জিনিষ ভালো ভাবে হয় না। যেমন আমরা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করেছি। সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা কারিগরী পত্র তৈরী করেন। তার পর ওটাকে মাঠে ছেড়ে দেয়া হয়। বিভিন্ন পর্যায়ের লোক জন তর্ক-বিতর্ক করেন, আলোচনা সমালোচনা, উচ্ছাস, উদ্বেগ ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়। তারপর মোটামুটি একটা খসড়া তৈরী করা হয়।

বর্তমান খসড়া নীতির মুদ্রিত বইতে সম্পাদন কমিটিতে বিপিএটিসির একজন এম ডি এস এর নাম রয়েছে। এছাড়া আর কোন প্রতিষ্ঠানে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। তবে আমরা আশা করব এটা ভবিষ্যতে যখন এটাকে চুড়ান্ত করা হবে, তখন এটাতে সবার অংশগ্রহণ থাকবে। কারণ, বাংলাদেশে অংশগ্রহণের কথা সর্বত্রই বলা হচ্ছে। আমরা উপজেলাস্তরে বলছি জনগনের অংশ গ্রহণের কথা। কিন্তু আমরা জাতীয় পর্যায়ে যেটা দেখতে পাচ্ছি সেখানে অংশগ্রহণছাড়া, একহাতে সংস্থাপন মনএণালয়ের এটা করা তো আমার মনে হচ্ছে যুক্তি সংগত হচ্ছে না। বিভিন্ন ট্রেনিং প্রতিষ্ঠানে যাঁরা আছেন, এ ক্ষেত্রে যে সকল প্রতিষ্ঠিত ও পরিচিত লোকজন আছে তাদের ব্যবহার করা উচিত। পাবলিক সার্ভিস কমিশন আছেন, তাদের এটার মধ্যে আসা উচিৎ, এবং তাদের মন্তব্য, বক্তব্য নিয়ে এটাকে সবার গ্রহণযোগ্য করে তোলা উচিত। সবাই যাতে এর মধ্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকে তা নিশ্চিত করা দরকার।

আজকের উপস্থাপক বলেছেন যে, বিপিএটিসি প্রশিক্ষণে গুরুত্বপূর্ন অবদান রেখেছে কিন্তু ১৯৮৪ সনে তার মত এরুপ ছিল না। তার মতের একটা পরিবর্তন হয়েছে। আসলে আমরা ১৯৮৪ সনে প্রস্তুত ছিলাম না। ২৮শে এপ্রিল বিপিএটিসি তৈরী করা হয়। আমার মনে আছে উনি ৪ঠা অক্টোবর এখানে একটা টিম নিয়ে আসেন। আমি ৩রা অক্টোবর এখানে যোগদান করি। সে সময়ে আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। আমাদের লোক-জন ছিল না। কিন্তু এখন আর সেই পরিস্থিতি নেই।

বলা হচ্ছে বেসরকারী খাতে প্রশিক্ষণ ভালো হচ্ছে। কোন রিপোর্ট বা জার্নালে তা পাওয়ার কথা। আমি কোন পেশাদারী লেখা এ ব্যাপারে কোন দিন দেখি নি। সুতরাং কিসের ভিত্তিতে বলছি যে, এটা ভালো? আমরা যদি জানতে পারি প্রাইভেট সেক্টর এনজিও কিসের নিরীখে ভাল করেছেন এবং আমরা কোথায় পিছিয়ে আছি তবে সেটা আমাদের সংশোধনের জন্য সুবিধা হবে।

প্রাইভেট সেক্টর ট্রেনিং ইনস্টিটিউশন ও পাবলিক সেক্টর ট্রেনিং ইনস্টিটিউশনের একটা প্রতিযোগতিার কথা বলা হয়েছে। আবার বলা হচ্ছে, প্রতিযোগিতার নিরীখে যথার্থতা প্রমান না করলে কোন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ববান থাকার অধিকার থাকবে না। পাবলিক ট্রেনিং ইনস্টিটিউশন এবং প্রাইভেট ট্রেনিং ইনস্টিটিউশন এ দুটোর মধ্যে চরিত্রগত একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। প্রাইভেট সেক্টরের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রশিক্ষণার্থীদের মুনাফা অর্জন। তাঁরা শেখাবে কি করে তাড়াতাড়ি মাল বাজার জাত করা যায়।

আমাদের এখানে পাবলিক ট্রেনিং ইনস্টিটিউশন সরকারের মৌলিক নীতি সরকার পদ্ধতি এবং অন্যান্য জিনিষ পড়ানো হয়। সুতরাং কর্মসূচীর প্রকৃতিও বেশ পৃথক। লোক প্রশাসন মৌলিকভাবে ও আবশ্যিক ভাবে বেসরকারী প্রশাসন হতে ভিন্নধর্মী। সুতরাং যেখানে মৌলিক ও চরিত্রগত পার্থক্য আছে সেখানে প্রশিক্ষণ ভিন্ন হওয়া উচিত। কেননা চাহিদা পৃথক। তাই এদের মধ্যে প্রতিযোগিতার অবকাশ খুব কম।

মাননীয় সভাপতি, আরেকটা লক্ষ্য করার ব্যাপার হচ্ছে যে, খসড়াটিতে প্রচুর ভুল আছে। প্রচুর মুদ্রণ ভুলও আছে। যেহেতু এটা একটি জাতীয় দলিল হবে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এটাকে পাঠানো হবে সুতরাং এই ভুল গুলো চূড়ান্ত করণ করার সময় সংশোধনের দরকার আছে। আরেকটা কথা আমি বলতে চাই যে, আমাদের এখানে আমরা আঞ্চলিক কেন্দ্র করবো। সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের বোধ হয় আমাদের একটা সিদ্ধান্ত দিতে হবে যে, আঞ্চলিক ধরনের কেন্দ্র করতে গেলে সিনিয়র ষ্টাফ কোর্সে পুরোপুরি ইংরেজীর ব্যবহার ঘটানো হবে কি না। আমার তিন বছরের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে, বুনিয়াদী প্রশিক্ষণার্থীরা বাংলায় পাঠ্য বিষয়দি পেতে চায়। এমনকি সিনিয়র ষ্টাফ কোর্সেও বাংলায় চান। এখন যে আইন করা হয়েছে তাতে তো ইংরেজীতে কাজ চালানো যাবে না। ফলে বিদেশীরা এখানে প্রশিক্ষণে আসলে তাদের জার্মানদের মত আগে বাংলা ভাষা শিখতে হবে তার পরে আমাদের সেমিনার কিংবা প্রশিক্ষণ এগুলো করতে হবে। তা ছাড়া তো কোন পন্থা দেখছি না। সুতরাং এ সমস্ত অসুবিধাগুলো আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। আমি যেগুলি বললাম সেগুলো সত্যিকারভাবে এবং ঐকান্তিকভাবেই অনুভব করছি। যদি সংস্থাপন মন্ত্রণালয় সহৃদয়তার সাথে বিবেচনা করে তাহলে আমরা বাধিত হবো। ধন্যবাদ।

জনাব আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী, পরিচালক, আর ডি এ, বগুড়া ঃ

সিনিয়র ষ্টাফ কোর্সে ইংরেজী ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে ডঃ এ টি এম শামসুল হুদা বলেছেন, বাংলাভাষা ব্যবহার সম্পর্কে বর্তমানে যে আইন চালু হয়েছে তাতে ইংরেজীতে কোন আঞ্চলিক কোর্স করতে অসুবিধা হবে না। কারণ সেই কোর্সে ইংরেজীই হবে মাধ্যম। আমাদের আভ্যন্তরীণ কোর্সগুলোর জন্য বাংলা বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ করতে হবে।

ডঃ হুদা প্রাইভেট ট্রেনিং ইনস্টিটিউশন সম্পর্কে বলেছেন। আমার জানামতে বাংলাদেশে 'র‍্যাপট ইন্টারন্যাশনাল' নামে একটি সংস্থা প্রাইভেট সেক্টরে ট্রেনিং ইনস্টিটিউশন হিসেবে ট্রেনিং দিয়ে থাকে। তাদেরকে ট্রেনিং ইনস্টিটিউশন বলা ঠিক না। কারণ তারা পুর্বানী হোটেলে, সোনারগাঁও হোটেলের মত জায়গায় প্রথমে অংশগ্রহণকারী জোগাড় করেন। পরবর্তীকালে এ সমস্ত স্থানে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করেন এবং যে সকল প্রশিক্ষক যান তাঁরা প্রধানতঃ সরকারী, আধা সরকারী প্রতিষ্ঠান হতে যান। তবে কোর্সের গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য কিছু পয়সা ব্যয় করে মধ্যে মধ্যে বাইরে (বিদেশে) থেকে কিছু প্রশিক্ষক আনেন। এ ছাড়া যে সমস্ত প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান সমুহ আছে, সেগুলো প্রধানতঃ মটর ড্রাইভিং এবং টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট। এর বাইরে অবশ্য রয়েছে প্রজেক্ট টাইড ট্রেনিং সেখানে বিভিন্ন গ্রুপ কনসালটেন্ট হিসাবে প্রতিযোগিতা করে। এ সমস্ত ক্ষেত্রে সাধারণতঃ দাতা সংস্থা রায় দেয় যে, কনসালটেন্ট নিয়োগ করতে হবে এবং কনসালটেন্ট গ্রুপের প্রভাবে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হয়। সেটা কতটুকু ভালো হয় তা আমি জানি না। তবে এ ধরনের প্রশিক্ষণ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করার জন্য শ্রদ্ধেয় রেক্টরকে সভাপতি করে একটা কমিটিও করা হয়েছিল বার্ডের একটি বোর্ড অব গভর্ণরস এর সভায়। এ কাজ এখনও সমাপ্ত করা হয় নি।

এনজিওদের প্রশিক্ষণ সম্পর্কে ড্রাফট পলিসিতে আলোচনা হয়েছে। এনজিও'রা সাধারনতঃ সর্ব নিম্ন পর্যায়ে অর্থাৎ গ্রাম পর্যায় মানুষকে সংঘবদ্ধ করার জন্য প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। এতে কোন সন্দেহ নেই। ব্রাক এ ধরনের কাজ করছে। গ্রামীন ব্যাংক এখন ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। গ্রামীন ব্যাংক ছাড়া এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণের ব্যয় এবং ফলাফল অর্থাৎ খরচ ও মুনাফার অনুপাত আমার মনে হয় বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন আছে। এ ধরনের প্রশিক্ষণ নীতির বইতে এ কথা গুলো বলা হয়েছে তার ২৭ পৃষ্ঠায়, ১২ অনুচ্ছেদে। এর 'সাব প্যারাতে' বলা হয়েছে যে, depending on the performance, a training institution has no right to exist if any training institute is found to have any unsatisfactory performance ইত্যাদি। তাহলে ট্রেনিং ইনস্টিটিউটকে উঠিয়ে দেয়া হবে। এটা আমার কাছে অনেকটা মাথা ব্যথা হলে মাথা কেটে ফেলার মত মনে হচ্ছে।

ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট খারাপ কাজ করছে এটা বোধ হয় বলা ঠিক নয় । ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটশনে যারা জড়িত আছেন, কাজ করছেন, তারা যদি ঠিক মত কাজ না করেন, তাহলে নুতন লোকে নিয়োগ করা যায় । যে উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়েছিল, সে কাজ যেন করা যায় । কিন্তু তা না করে একেবারে সমুলে উঠিয়ে ফেলে, প্রশ্ন আসবে এন টি সি প্রথমে কেন এই ইনষ্টিটিউট স্থাপনের অনুমতি দিয়েছিল । কিংবা সরকার কেন এ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন । এ ব্যাপারে আমার মনে হয় সংশোধনের অবকাশ আছে । আর একই পৃষ্ঠায় ১২·৫ অনুচ্ছেদে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে সেটাও ডঃ হুদা বলেছেন । আমি তার সংগে একমত যে , এখানে এন টি সি'র মাধ্যমে নিয়মিত পরিদর্শন ব্যবস্থার যে চিন্তা ভাবনা করা হয়েছে সেটা আমি মনে করি । বাস্তবে আরোপ করা সম্ভব হবে না । তাহলে আমাদেরকে ' কোঅর্ডিনেশন এন্ড কনেট্রাল সেল ফর ন্যাশনাল ট্রেনিং ' করতে হবে যাঁরা এনটিসির অধীনে বাস্তবায়ন কাজটি করবেন । সেটা কতটা প্রয়োজন ?

আমিও আমার পুর্ববর্তী বক্তাদের নীতি প্রণেতাদের ধন্যবাদ জানাইতে চাই , অন্ততঃ প্রথম বারের মত চেষ্টা করা হলো একটি নীতি নির্ধারণ করার, যাঁরা কাজ করেছেন এবং এর সাথে জড়িত তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই । আমি নিজেকে প্রশিক্ষক দাবী করি না । তবে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছি , সে হিসেবে আমি মনে করেছি যে, এ ধরণের একটা নীতির প্রয়োজন আছে । এ খসড়া নীতি পড়ে আমার একটা ধারণা হয়েছে যে , নীতি নির্ধারণের জন্য বা নীতি প্রণয়নের জন্য প্রশিক্ষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে জাতীয় পর্যায় শিক্ষা নীতি, জনশক্তি পরিকল্পনা অনেক কিছু এর মধ্যে, অল্প জায়গায় বলার চেষ্টা করা হয়েছে । সে জন্য বোধ হয় সমস্ত জিনিষ পরিপুর্নভাবে ব্যাখ্যা [illegible] করা যায় নি । তবে আমার মনে হয় শিক্ষানীতি জনশক্তি পরিকল্পনা এগুলো বাদ দিয়ে শুধু মাত্র ট্রেনিং বলতে আমরা যা বুঝি তার মধ্যে যদি সীমাবদ্ধ রাখা যায় তাহলে হয়ত আমরা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে কাজ করছি, প্রশিক্ষণের ব্যাপারে যারা উৎসাহী তারা লাভবান হবো ।

এই খসড়া প্রশিক্ষণ নীতিতে দেখা যায় যে , বিদেশী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি নির্ভরশীলতা কমিয়ে দেশী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে অধিক সংখ্যক প্রশিক্ষণ দেয়ার কথা বলা হয়েছে । তবে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে জড়িত থেকে আমি দেখছি যে , সরকার এ পর্যন্ত কথাবার্তা বলে আসছেন, কিন্তু কার্যতঃ এটা করা হচ্ছে না ।

- ১০৫ -

প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গুলোকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে গেলে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা, অবকাঠামো তৈরী করা প্রয়োজন। যেমন বিপিএটিসিতে আমরা দেখেছি দালান কোঠা হচ্ছে। আমি পল্লী উন্নয়ন একাডেমীতে কাজ করি, সেখানেও অনেক দালান কোঠা হচ্ছে। কিন্তু আমি দেখেছি যে, পল্লী উন্নয়ন একাডেমীতে যে পরিমান সুযোগ সুবিধা বর্তমানে রয়েছে, ততটুকু প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব সেটা আমরা দিতে পারছি না। এখানে খসড়া প্রশিক্ষণ নীতিতে বলা হয়েছে যদিও ঠিকমত কাজ না করতে পারে তাহলে বাজেট কেটে দিতে হবে। আমি দেখেছি ঠিক উল্টোটা আমার দেশে প্রযোজ্য। আরডিএতে সুযোগ্য সুবিধা রয়েছে, আমি আরও বেশী প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করতে পারি। কিন্তু আমার লোকবল নেই। আমাকে রাষ্ট্র লোকবল দিলে আমি বরং [illegible] আমার যে সুযোগ সুবিধা রয়েছে সেটা করতে পারি। কাজেই আমি মনে করি যে, প্রশিক্ষণ নীতিতে 'নিগেটিভ না নিয়ে পজিটিভ' দৃষ্টি ভংগী নেয়া উচিত যাতে দক্ষতা এবং ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়। তার জন্য বাজেট দেয়ার ব্যবস্থা জোরদার করলে আমার মনে হয় অনেক ভাল হবে। বাজেট কাটার প্রয়োজন বোধ হয় খুব কম সংখ্যক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এটা আমার ব্যক্তিগত ধারণা।

দ্বিতীয়তঃ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য, দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দরকার প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে যাঁরা কাজ করবেন তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি। তাদের উচ্চতর প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। বর্তমানে সরকার বিদেশী প্রশিক্ষণ সম্পর্কে এই খসড়া প্রশিক্ষণ নীতিতে তৈরী করেছেন। আমি মনে করি যে, যে বিদেশ প্রশিক্ষণের নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে তা প্রধানতঃ আমলাতন্ত্র বলতে আমরা যা বুঝি, সরকারের যারা কাজ করেন তাদের [illegible] বিদেশ যাওয়া বন্ধ করার জন্যই করা হয়েছে। যে নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে তার ফলে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গুলো মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এ নীতির ফলে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সমুহের যাঁরা স্থায়ী ভাবে কাজ করেন তাদের মধ্যে বিরুপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে যাঁরা স্থায়ী কর্মকর্তা তাদের বিদেশ যাওয়া, বিদেশে প্রশিক্ষণ উচ্চতর ডিগ্রী লাভ এগুলোর ব্যাপারে সরকারের বর্তমান যে নীতি তা নিসন্দেহে পরিবর্ত ন দরকার। এ পরিবর্তন না হলে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে কিছুতেই জোরদার করা যাবে না।

আমি প্রস্তাব করছি যে, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে যারা সরাসরি স্থায়ী ভাবে চাকুরী করবেন তাদের ক্ষেত্রে এই করা উচিত যে, প্রথম ২ বছর তারা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে কাজ করবেন। দেশের ভিতরে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত যে সমস্ত কোর্স হবে সেগুলো গ্রহণ করবেন, ২ বছর পরে তাদেরকে স্বল্প মেয়াদী তিন থেকে ছয় মাসের কোর্সে বাইরে পাঠানো হবে।

সেখান থেকে ফেরত আসার পর বছর দুই/তিনেক চাকরী করার পরে আদেরকে মাষ্টারস ডিগ্রী দেয়ার জন্য বাইরে পাঠানো দরকার আর ৪০ বছরের আগে নয় । সরকারের নীতি হলো ৩৫ বছরের পরে কাউকে পাঠানো যাবে না । আর আমার বক্তব্য হলো যে, ৪০ বছরের আগে কাউকে পিএইচডি'র জন্য বাইরে পাঠানো উচিত নয় । এটা বলার উদ্দেশ্য হলো যে ,তা'হলে এরা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে কাজ করবেন । এম,এস ডিগ্রী নিয়ে আসার পর আবার [illegible] সুযোগ পাবেন । আর ৪০ বছরে যখন পিএইচ ডি ডিগ্রী নিয়ে আসার পর ঐ বয়সে সাধারনতঃ অন্যত্র চলে যাওয়ার প্রবণতা থাকে না । কাজেই এদের অভিজ্ঞতা অন্ততঃ ১০/১২ বছর প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান পাবে । এবং এভাবে যদি নীতি প্রণয়ন করা হয় আমি মনে করি যে , প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে জোরদার করার যে কথা এই পলিসিতে বলা হয়েছে এটা করা সম্ভব হবে ।

উপজেলা প্রশিক্ষণ সম্পর্কে দু' একটা কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করবো । ট্রেনিং পলিসিতে উপজেলা প্রশিক্ষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে , (২৪ পৃঃ ১১·৩ অনুচ্ছেদে) " Unfortunately these UTD's were never put to use for the purpose these were set up " এ বক্তব্যটি এখানে থাকা আমি সমীচীন মনে করি না, কারণ UTD's were very much used for training" যতদিন পর্যন্ত এই ট্রেনিং এর জন্য অর্থ পাওয়া গেছে ততদিন প্রশিক্ষণ হয়েছে । যে মুহূর্তে এই অর্থ পাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে তার পর থেকে এগুলো ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না । এটাই প্রকৃত অবস্থা ।

এই ট্রেনিং পলিসিতে " ট্রেনিং নিড এসেসমেন্ট " এর কথা বলা হয়েছে । তাতে একটা মনে হয়েছে যে , অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ এই " নিড এসেস " করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের, বিভিন্ন সংস্থার ট্রেনিং পলিসি কতটুকু আভ্যন্তরীণ হবে, কতটুকু বাইরে হবে তা যাচাই করবেন । কিন্তু এটা স্ববিরোধী । আমরা দেখেছি যে , পাঁচ বছরের জন্য কোথায় ক'টি দেশে ট্রেনিং হবে, কটি বিদেশে ট্রেনিং হবে এটা বলে দেয়া হচ্ছে । এটা ৫ বছরের জন্য নির্ধারিত হয়েছে । কাজেই ৫(পাঁচ) বছরের জন্য আর নুতন ভাবে যাচাই ও নির্নয়ের কোন সুযোগ থাকে না । কাজেই আমার মনে হয় যে , এখানে এই অধ্যায়ে যেটা সুপারিশ করা হয়েছে সেটা বরং বাদ দেয়া যেতে পারে । দেশের ভিতরে প্রশিক্ষণকে বেশী গুরুত্ব দিতে হবে । বিদেশী প্রশিক্ষণের জন্য এই নীতি অনুস্মরণ করতে হবে । আমার মতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং সংস্থাকে স্বাধীনতা দেয়া উচিত ।

সেখান থেকে ফেরত আসার পর বছর দুই/তিনেক চাকরী করার পরে আদেরকে মাষ্টারস ডিগ্রী দেয়ার জন্য বাইরে পাঠানো দরকার আর ৪০ বছরের আগে নয় । সরকারের নীতি হলো ৩৫ বছরের পরে কাউকে পাঠানো যাবে না । আর আমার বক্তব্য হলো যে, ৪০ বছরের আগে কাউকে পিএইচডি'র জন্য বাইরে পাঠানো উচিত নয় । এটা বলার উদ্দেশ্য হলো যে ,তা'হলে এরা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে কাজ করবেন । এম,এস ডিগ্রী নিয়ে আসার পর আবার [illegible] সুযোগ পাবেন । আর ৪০ বছরে যখন পিএইচ ডি ডিগ্রী নিয়ে আসার পর ঐ বয়সে সাধারনতঃ অন্যত্র চলে যাওয়ার প্রবণতা থাকে না । কাজেই এদের অভিজ্ঞতা অন্ততঃ ১০/১২ বছর প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান পাবে । এবং এভাবে যদি নীতি প্রণয়ন করা হয় আমি মনে করি যে , প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে জোরদার করার যে কথা এই পলিসিতে বলা হয়েছে এটা করা সম্ভব হবে ।

উপজেলা প্রশিক্ষণ সম্পর্কে দু' একটা কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করবো ।ট্রেনিং পলিসিতে উপজেলা প্রশিক্ষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে , (২৪ পৃঃ ১১·৩ অনুচ্ছেদে) " Unfortunately these UTD's were never put to use for the purpose these were set up '' এ বক্তব্যটি এখানে থাকা আমি সমীচীন মনে করি না, কারণ UTD's were very much used for training'' যতদিন পর্যন্ত এই ট্রেনিং এর জন্য অর্থ পাওয়া গেছে ততদিন প্রশিক্ষণ হয়েছে । যে মুহূর্তে এই অর্থ পাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে তার পর থেকে এগুলো ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না । এটাই প্রকৃত অবস্থা ।

এই ট্রেনিং পলিসিতে " ট্রেনিং নিড এসেসমেন্ট ' এর কথা বলা হয়েছে । তাতে একটা মনে হয়েছে যে , অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ এই ' নিড এসেস ' করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের, বিভিন্ন সংস্থার ট্রেনিং পলিসি কতটুকু আভ্যন্তরীণ হবে, কতটুকু বাইরে হবে তা যাচাই করবেন । কিন্তু এটা স্ববিরোধী । আমরা দেখেছি যে , পাঁচ বছরের জন্য কোথায় ক'টি দেশে ট্রেনিং হবে, কটি বিদেশে ট্রেনিং হবে এটা বলে দেয়া হচ্ছে । এটা ৫ বছরের জন্য নির্ধারিত হয়েছে । কাজেই ৫(পাঁচ) বছরের জন্য আর নুতন ভাবে যাচাই ও নির্নয়ের কোন সুযোগ থাকে না । কাজেই আমার মনে হয় যে , এখানে এই অধ্যায়ে যেটা সুপারিশ করা হয়েছে সেটা বরং বাদ দেয়া যেতে পারে । দেশের ভিতরে প্রশিক্ষণকে বেশী গুরুত্ব দিতে হবে । বিদেশী প্রশিক্ষণের জন্য এই নীতি অনুস্মরণ করতে হবে । আমার মতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং সংস্থাকে স্বাধীনতা দেয়া উচিত ।

বর্তমানে খসড়া নীতিতে যথেষ্ট মুদ্রণ প্রমাদ রয়েছে এবং যথেষ্ট বাক্যেরও ভুল রয়েছে। ভবিষ্যতে যাঁরা সম্পাদনা করবেন তাদের মধ্যে দু'একজন লোককে অন্তর্ভুক্ত করার দরকার যারা ইংরেজী ভাষা সম্পর্কে, বাক্য গঠন সম্পর্কে ভালোভাবে অভিজ্ঞ। এদিকেও আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই ছয় পৃষ্ঠায় এপেক্স ট্রেনিং সেক্টারের কথা বলা হয়েছে। আমরা বৈজ্ঞানিক কোন জার্নালে কোন লিখা দিলে টার্মগুলো ব্যাখ্যা করি, এ ক্ষেত্রেও তাই করা উচিত ছিল। এপেক্স দিয়ে কি বলতে চাওয়া হয়েছে? কারণ এপেক্স এর শাব্দিক অর্থ শীর্ষ এখানে অনেক অর্গানাইজেশন বা ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটের নাম এসেছে অথচ এপেক্স হবে সেটা যা বিভিন্ন জনের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়, যদি প্রশাসন বিষয়ে পিএটিসি এপেক্স, পল্লী উন্নয়নে বার্ড এপেক্স হয়, তবে আমার কোন বক্তব্য নেই। তবুও সেটাকে একটা বাক্য দিয়ে বা একটা ক্লজ দিয়ে একটু পরিস্কার করলে ভালো হতো। যাই হোক, একটা ভিত্তি প্রণীত হয়েছে এবং পরবর্তী কালে এটা চুড়ান্ত রুপ নেবে। এবং এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, আমরা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে যাঁরা জড়িত, যারা উৎসাহী এবং আমরা সবাই উপকৃত হবো এই আশা রাখছি।

জনাব আমির হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক, গ্রাজুয়েট ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট ঃ

অনেকের মতো আমারও একটা প্রশ্ন, পলিসি আগে না প্ল্যান আগে। আমাদের মোটামুটি ধারণা, পলিসি হলো এমন একটা গাইড লাইন যেখানে তাত্ত্বিক ধারনাগুলো থাকে এটাতে যখন কাঠামোবদ্ধ করা হয়, সময় নির্ধারণ করা হয় তখনই সেটা প্ল্যান আকারে বা প্রোগ্রাম আকারে অভিহিত হয়। এখানে ঠিক ন্যাশনাল ট্রেনিং পলিসি হিসাবে যে বিষয়বস্তু গুলো উপস্থিত হয়েছে তা ঠিক তাত্ত্বিকভাবে নীতি না হয়ে অনেকটা প্ল্যানিং এর রুপ পেয়েছে।

প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে গবেষণা ও উপদেশনার কাজ নেবে বলা হয়েছে। যারা ঢাকায় থাকেন তারা হয়ত কিছু কনসালটেনসি সুযোগ পান, মফস্বলে আমরা যারা আছি তারা তা চিন্তাই করতে পারি না। তাই আমার প্রশ্ন যেখানে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে আদৌ আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করা যাবে কি না। আমিও অনেকের সাথে একমত যে, যাঁরা স্থায়ীভাবে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন তাদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণের সুযোগ সীমিত হয়ে পড়েছে। অথচ বিদেশী প্রশিক্ষণ না হলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দিন দিন যে অগ্রগতি হচ্ছে তা বুঝবার এবং অনুধাবন করার সুযোগ আমাদের হবে না।

ইংরেজীতে একটা কথা আছে যে , you are to run hard to stand still. আজকে বিংশশতাব্দীতে জয়ের যে সম্মুখ যাত্রা সেখানে এক জায়গায় দাড়িয়ে থাকতে হলেও খুব জোরে দৌড়াতে হবে। কাজেই বিদেশী প্রশিক্ষণকে বন্দ করা আমাদের নিজেদেরই আত্মহত্যার নামান্তর হবে। আমার মনে হয় বিদেশী প্রশিক্ষণের নিয়ম নীতিগুলোকে আরো নমনীয় করা দরকার।

জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতিতে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা ও দক্ষতার বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই গ্রেডিংয়ে যে বিভিন্ন শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে এ ব্যাপারে কোন গবেষণা পরিচালিত হয়েছে কি ? কি ভিত্তিতে এটাকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এ ব্যাপারেও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা থাকা দরকার।

ইনসেনটিভ এর ব্যাপারে বলা হয়েছে যে , The trainers are requied to be highly professional and it is upto them to keep themselves abreast with the latest develppment in thier professional field. কাজেই একদিকে পেশাদারীত্বের কথা বলা হচ্ছে, অন্যদিকে বিদেশ প্রশিক্ষণ জটিলতা সৃষ্টি করা হচ্ছে , এটা অনেকটা সুবিরোধিতার নামান্তর। প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপণের ক্ষেত্রে নুতন নুতন কৌশল আবিস্কৃত হয়েছে, প্রশ্নমালা বিতরণের মাধ্যমে তা করা যায় । সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে করা যায়, সমাজের গতিধারা ও সচলতা দেখে তা করা যায়। তাই আমার ধারণা বৈজ্ঞানিক ও নুতন কৌশল আমাদের গ্রহণ করতে হবে।

অনেক বক্তা উপজেলা পর্যায়ের বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব গণপ্রতিনিধি, এমপিদের প্রশিক্ষণের কথা বলেছেন। আমিও তাদের সাথে একমত।

আমি আর একটি প্রস্তাব করছি। পল্লী উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করার ব্যাপারে বার্ড, আর ডি এ, যেমন দায়িত্ব পালন করেছে, জিটিআইতেও সে দায়িত্ব কিছুটা দেয়া যেতে পারে। জি টি আই কে এপেক্স প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

পরিশেষে বলছি যে , এই খসড়া শিক্ষা নীতিতে যে পরিসংখ্যান দেয়া হয়েছে তার অনেক গুলো সম্পর্কে আমার সন্দেহ রয়েছে। আর ভাষার ব্যাপারে এতে জটিলতা ও প্রমাদ রয়েছে বলে আমার মনে হয়। চূড়ান্ত নীতিতে তা সংশোধন হওয়া দরকার।

সবাইকে ধন্যবাদ।

জনাব এম,এ, সামসুল হক

প্রশিক্ষণের একটা সার্বিক দিক রয়েছে । এ সার্বিক দিকগুলোর মধ্যে কতগুলো জিনিষ হলোঃ- কার জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচী কে প্রশিক্ষণ দেবেন ? কোথায় , কিভাবে এবং কি প্রশিক্ষণ দেবেন ? এগুলো জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতিমালায় উপস্থাপিত হয়েছে । উপস্থাপনায় পরিধি, পরীক্ষণ, ও মূল্যায়ন সবকিছুর দিক-নির্দেশনা রয়েছে । এ প্রশিক্ষণ নীতি মালার কত গুলো উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং পরিব্যপ্তি ও আজকে আলোচিত হয়েছে । কোথায় কি করতে হবে এবং কোথায় অসুবিধা আছে তাও প্রতিফলিত হয়েছে । এগুলোকে ভিত্তি করেই আমরা খসড়া নীতিমালা আরো ভাল ভাবে প্রণয়ন করার চেষ্টা করব । আমার আলোচনায় আমি শুধু গুণগত দিক নিয়ে দু একটি কথা বলব । আমি প্রথমে বলব কার জন্য প্রশিক্ষণ এবং কার দ্বারা এটা পরিচালিত হবে এবং এছাড়া কখন, কোথায় এবং কিভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে-এগুলোর দিকে দৃষ্টি দিলে অবশ্যই আমরা জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতিমালার খসড়া দলিল চূড়ান্ত করতে পারব ।

আমাদের প্রশিক্ষণ নীতিমালায় স্বল্প মেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে এবং এটাকে সেভাবে সিনথেসাইজ করার চেষ্টা করা হয়েছে । আমরা সর্বদা বিভিন্ন পরিকল্পনা দলিলে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করছি এবং বলছি । আমাদের কর্মসংস্থান নীতি হওয়ার উচিত কিন্তু কিভাবে এগুলো ফিডব্যাক করব এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমে সফলকাম হতে পারব? সেক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ নীতির একটা বলিষ্ঠ ভূমিকা রয়েছে । এখানে সব স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী দু'টো দিকের মাধ্যমে প্রশিক্ষণনীতি প্রণয়ন করার চেষ্টা করা হয়েছে । পরিকল্পনার এবং যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দলিলে আমরা যা করছি তারও একটা দীর্ঘ মেয়াদী পরিপ্রেক্ষিত রয়েছে । মানব সম্পদ নীতি ও জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতিমালার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে । এতে প্রশিক্ষণ নীতি মালার যে ফাঁক গুলো রয়েছে সেগুলো কমিয়ে আনা যেতে পারে ।

কাদের দ্বারা প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালিত হবে ? প্রশিক্ষকদের উন্নতির জন্য বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রশিক্ষণ নীতি মালায় থাকা দরকার । এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে যে ধরনের প্রশিক্ষণার্থী আসেন এবং যে ধরনের বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেয়া হয় তাতে সকলের উপর এর সুফলটা ঠিকমত বর্তায় না । কেননা, তাঁরা আসেন বিভিন্ন সুর থেকে । তাই এখানে যে পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করা হয় তার দিকে আমাদের নজর দিতে হবে ।

উপস্থাপক শিক্ষা মডেল ও প্রশিক্ষণ মডেলের কথা বলেছেন । এ জন্য প্রতিনিধিত্ব মূলক ঘটনা সমীক্ষা তৈরী করতে হবে । একই সংগে গুণগত মানের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে । উপস্থাপক তথ্য প্রবাহের কথা বলেছেন , যেটা খুবই প্রয়োজনীয় । কেননা , এ পদ্ধতি গড়ে তোলার মাধ্যমেই আমরা প্রশিক্ষণে কার্যকারিতা অর্জন করতে পারি । এই খসড়া নীতির পর্যালোচনা অংশ তৃতীয় অধ্যায়ের ৭৮ নং পৃষ্ঠায় যে বৈপরীত্য এবং পরিসংখ্যান গত অসামঞ্জস্যতা রয়েছে তার কারণ হলো তথ্য প্রবাহ পদ্ধতি ঠিকমত উন্নত করা হয় নি । উল্লেখ্য, এখানে বিভিন্ন প্রধান প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ ঘন্টা হিসেব করে বের করা হয়েছে তা ত্রুটিযুক্ত । আমার বিশ্বাস, তথ্য প্রবাহ পদ্ধতি প্রয়োগ করলে এটা আমরা দূর করতে পারি । আমাদের যে প্রশিক্ষিত মানবশক্তি এবং ব্যবস্থাপকের প্রয়োজন তা আমরা প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নিরূপনের মাধ্যমে , তথ্য প্রবাহ পদ্ধতির দ্বারা নির্ধারণ করতে পারি । এই প্রশিক্ষণ লক্ষ্যের উপর আমাদের একটা কর্মসূচী প্রণয়ন করতে হবে । এখানেই শেষ নয় ; আমাদের অবিরত ভাবে সম্পদের ও পার্সোনেলের পরীক্ষিণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে এটাকে সময়োপযোগী করে তোলার প্রয়াস চালাতে হবে ।

আমাদের দক্ষ জনশক্তি ও ব্যবস্থাপকের অভাব রয়েছে । তাই আমাদেরকে দক্ষতা ও উৎপাদন-শীলতা বাড়ানোর লক্ষ্যে, প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সর্বদা উন্নত ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করতে হবে ।

আমরা যেহেতু সর্বদা উন্নয়ন পরিকল্পনার কথা বলি, তাই আমাদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মধ্যে দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন প্রতিফলিত হওয়ার দরকার । এতে প্রশিক্ষণার্থীরা পরিকল্পনার, উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাবে । আমরা জনপ্রশাসনে যে প্রশিক্ষণ দিচ্ছি তার প্রধান প্রনিধানযোগ্য বিষয় হওয়া উচিত প্রায়োগিক ক্ষেত্রে পেশাদারী উন্নয়ন । আর এ ধরনের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যক্তিগত খাত, এনজিও এবং বিভিন্ন প্রধান প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সহযোগে পাঠ্যক্রম বা সিলেবাস প্রণয়ন করতে পারি ।

কখন প্রশিক্ষণ দেয়া হবে অর্থাৎ প্রশিক্ষণার্থীরা কখন প্রশিক্ষণে আসবেন ? অর্থাৎ তাঁদের বয়সের দিকটা খেয়াল রাখা দরকার । এই দলিলে এপেক্স বা শীর্ষ স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কত-গুলো মুখ্য প্রতিষ্ঠান কে দেখানো হয়েছে, কিন্তু এটা চূড়ান্ত করার পূর্বে আরো কতগুলো প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে ভেবে দেখা দরকার । যেহেতু এটা একটা খসড়া দলিল, তাই এটা উন্নত করা সম্ভব ।

পরিচিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও একই বিষয়ে যারা প্রশিক্ষণদানরত স্বল্প পরিচিত প্রতিষ্ঠানের কার্য-এমের সমন্বয় কিভাবে করা যায় তাও ভেবে দেখা দরকার । সে দিকে চিন্তা ভাবনা করা দরকার।

খসড়া দলিলে গবেষণা ও উপদেশনার কথাও বলা হয়েছে । আমার বক্তব্য হলো গবেষণা ও উপদেশনার মাধ্যমে নিজে অর্থ সংস্থানের কথা না ভেবে গবেষণা ও উপদেশনার মাধ্যমে ঘটনা সমীক্ষা প্রস্তুতের কথা ভাবা দরকার । ঘটনা সমীক্ষা সম্পাদন করলে পরবর্তীতে প্রশিক্ষণের সিলেবাসে তা অর্ন্তভুক্ত করা যেতে পারে কতগুলো দিক ।

সৈয়দ সাইফুল ইমাম

জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতি মালার আলোকে মানবশক্তি উন্নয়ন ইত্যাদি বিবেচনা করতে গেলে ব্যাংকিং সেক্টরের গুরুত্ব সহজেই অনুমান করা যায় । কোনটি শীর্ষ স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা পাবে, তা নিয়ে কথা উঠেছে ।

বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংককে এপেক্স বা শীর্ষস্থানীয় হিসেবে ধরা যেতে পারে । সামগ্রিকভাবে ব্যাংকিং সেক্টরের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বি আই বি এম কে ও এপ্রেক্স বা শীর্ষ স্থানীয় হিসেবে ধরা হয়নি । বৈদেশিক প্রশিক্ষণের প্রতি আমারও লোভ আছে । তবে কেন এটা কমানোর কথা বলা হচ্ছে তা আমি বুঝতে পারছি না ? বৈদেশিক প্রশিক্ষণে নির্বাচনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রধানের ভূমিকাই অগ্রগন্য হওয়ার উচিৎ , কোন মন্ত্রণালয় নয় ।

জনাব সিদ্দিক

প্রতিটি মন্ত্রণালয় বা প্রতিষ্ঠানের অধীনে প্রশিক্ষণ পরিষদ বা উপদেষ্টা পরিষদ থাকা দরকার এতে তারা নিজেরা নিজেদের প্রশিক্ষণ প্রয়োজনীয়তা অনুধাবনে সচেষ্ট হবেন ।

মুখ্য উপস্থাপক প্রশিক্ষণে এম আই এস পদ্ধতির অনুভুক্তির সুপারিশ করেছেন আমি তাঁকে স্বাগত জানাই । এটা একটা প্রনিধানযোগ্য সুপারিশ । কোন প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হচ্ছেন গুরুত্ব-পূর্ণ । এজন্য মন্ত্রণালয় বা কোন পরিদপ্তরের আওতাধীন কোন প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষক নির্বাচনের

বিষয়টি সুসংবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন । জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতি মালায় কোন প্রশিক্ষকের কার্যকাল তিন বৎসর উল্লেখ্য রয়েছে । এটা অপ্রতুল । তাই এটা পরিবর্তন করে পাঁচ বৎসর করা দরকার । কেননা, কোন প্রশিক্ষককে প্রশিক্ষণ পদ্ধতি রপ্ত করতে ও বিদেশী প্রশিক্ষণ নিতেই অর্ধেক সময় ব্যয় করতে হয় । বিদেশী প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অত্যধিক । কেননা আমাদের প্রশিক্ষকদের বিদেশ হতেই শিখতে হবে । তাই বৈদেশিক প্রশিক্ষণ বিষয়ে যে বিধি নিষেধ আছে তা দূর করা দরকার ।

প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নিরুপণের জন্য কোন মডেল বর্তমান জাতীয় নীতিমালায় বর্ণনা করা হয়নি । তাই এটার সংযোজন দরকার ।

আনোয়ারুল হক
এম, ডি, এস, নিয়েযার ।

আলোচ্য খসড়া নীতিটিকে জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতি বলা হলেও , এটা আসলে একটা নীতি খসড়া এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তা প্রণীত হয়েছে । এটা প্রথম পৃষ্ঠাতে মুদ্রিত থাকা উচিত ছিল । দ্বিতীয়তঃ জাতীয় প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী এতে বিধৃত থাকলে ভালো হতো । এটাতে কিছু মুদ্রণ সংক্রান্ত ত্রুটি আছে যা কয়েকজন বলেছেন । এপেক্স-এর সংজ্ঞা নিয়ে দ্বিমতের অবকাশ রয়েছে । একটা বিষয়ে এখানে ভুল বলা হয়েছে যে নিয়েয়ার শিক্ষা ক্যাডারের সকল সদস্যকে পেশাভিত্তিক ও চাকুরী মধ্যবর্তী প্রশিক্ষণ দেয় । আসলে এখনও এটা সিদ্ধান্ত , এটা কার্যকরী করা সম্ভব হয় নি । কেননা, প্রয়োজনীয় তহবিল এখনও পাওয়া যায়নি । তবে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞতা ও সুযোগসুবিধা রয়েছে । এখানে নিয়েয়ারকে শীর্ষ স্থানীয় বা এপেক্স প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা দেয়া হয়নি । যদিও এটা পুরানো প্রতিষ্ঠান এবং প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা এর রয়েছে । আমার সর্বশেষ বক্তব্য এই যে, নিয়েয়ার এ যারা প্রেষণে নিযুক্ত হন : শিক্ষা মন্ত্রণালয় তাদের হঠাৎ বদলী করে দেন । কিন্তু এ সকল অভিজ্ঞ প্রশিক্ষককে বদলী করা উচিত নয় , ভারতের নিপাতে ( ) এমনটি করা হয় না ।

জনাব হজরত আলী ঃ

গতকল্য থেকে শুনেছি যে, প্রশিক্ষণের যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা রয়েছে। এমন কি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তহবিলের অভাব হয় না। শুধু অভাব হচ্ছে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষকের ও প্রশিক্ষণার্থীর। প্রকৃত পক্ষে এটা একটা আংশিক সত্য। কেননা, আমার প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান যেটা ১৯৭৬ সন থেকে কাজ করে আসছে তার প্রয়োজনীয় দালান কোটা অদ্যাবধি নির্মান করা হয় নি। কিন্তু আমার প্রতিষ্ঠান কয়েকবার বিদেশী প্রশিক্ষণার্থীদেরকেও প্রশিক্ষণ দিয়েছে কিন্তু এখনও বিমাতা সুলভ আচরণ আমার প্রতিষ্ঠানকে দেখানো হচ্ছে।

জনাব আল-হোসাইনী, সভাপতি ঃ

উপস্থপককে ধন্যবাদ। আলোচ্য খসড়াটি জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতির খসড়া। এটার সারবস্তু এবং অন্যান্য বিষয়ে বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছে। অনেকে গুরুত্বপুর্ন কথা বলেছেন। তাই এ ব্যাপারে স্পর্শ কাতর না হয়ে খোলাখুলি মনে গ্রহণ করে কিভাবে এটাকে সুন্দর, সুবিন্যাস্ত এবং সুসংহত করা যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

নীতি নির্ধারণী প্রবন্ধ লেখা বড় জটিল ব্যাপার। স্বাধীনতা উত্তর একটি অভিজ্ঞতার কথা বলছি। আমি কর্মজীবনে বিভিন্ন মনত্রালয় ও সংস্থায় অনেক লিখেছি। বাংলাদেশে যখন আমি প্রথম নীতি নির্ধারণী পত্র বা প্রবন্ধ লিখলাম তখন আমি প্রাকৃতিক সম্পদ মনত্রালয়ে ছিলাম। আমাদের তেল ও গ্যাস সর্ম্পকে কোন কাগজ ছিল না, সব ইসলামাবাদে আটকা পড়েছিল। তেলের দাম হু হু করে বাড়ছে। এটা আমার দৃষ্টি এড়ায় নি, যদিও পরিকল্পনা কমিশন তা খেয়ালই করে নি। অথচ তেলের অভাবে শোধনগার বন্ধ প্রায়। কিন্তু তেলের ব্যবহার দ্বিগুন করার স্বপ্ন দেখা হচ্ছে। গ্যাস আবিস্কার হলেও তার কোন সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হয় নি। ঐ রকম একটা পরিস্থিতিতে আমি এনার্জি বা ইন্ধন শক্তির উপর একটা নীতি নির্ধারণী পত্র লিখলাম। বংগবন্ধুর নিকট এটা দিলাম। উনি উপ রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে দিলেন। উনি প্রশংসা করলেন কিন্তু কোন কাজ হলো না। এর পরেও অনেক লিখেছি। আমি উদাহরন দিয়ে আপনাদের বিরক্ত করব না।

নীতি নির্ধারণী পত্র লিখতে গেলে নির্দেশনার অভাব দেখা দেয়। কর্মসূচী ও কৌশলের দিকে দৃষ্টি চলে যায়। তেমনি ভাবে এখানেও জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতির বাইরে অনেক কিছু বলা হয়েছে। সেগুলো অন্যভাবে থাকতে পারত। অনেক আলোচক সেদিকে আলোকপাত করেছেন। তবে আমি এটার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করি। নীতি নির্ধারণ পত্র লিখতে হলে অনেক বিশ্লেষণধর্মী অনুশীলন দরকার।

অনেক বিশ্লেষণ ও ষ্টাফ ওয়ার্ক দরকার। মনে হয় সংস্থাপন মন্ত্রালয় একইভাবে এটা করেছেন। এবং উপস্থাপকও তাই বলেছেন। এখানে ষ্টাফ ওয়ার্ক আছে কি না আমি জানি না। কিন্তু ষ্টাফ ওয়ার্ক ছাড়া পূর্ব মনোভাব অথবা মূল্যবোধ নীতিপত্রে এসে যায়। এটার অর্থ এই নয় যে, মূল্যবোধ বা নিজ সিদ্ধান্ত নিরর্থক বা ভুল। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই অনেকে তা করে থাকেন। অংশগ্রহণ মূলক পদ্ধতি না ব্যবহার করলে এটা বেশী ঘটে। এ পত্রে কৌশল নীতি ও কর্মসূচী এগুলো আলাদা আলাদাভাবে দেখালে বিতর্কের যে সূত্রপাত হয়েছে সেটা হয়ত হতো না। আশার বিষয় হচ্ছে যে, এটা একটা খসড়া। তাই অদূর ভবিষ্যতে এটা উন্নত করা যাবে।

এ পত্রে জন প্রশাসন খাতে উন্নতির জন্য দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলির কথা বলা হয়েছে। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনা গুলোতে ছিল। আমার প্রস্তাব হচ্ছে সেগুলোর সংগে এটার সঙ্গতি রাখা দরকার। যাতে জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতির সংগে জাতীয় পরিকল্পনার বিরোধ না বাধে। এপেক্স বা শীর্ষস্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সম্মান মর্যাদা নিয়ে স্পর্শকাতরতা রয়েছে এবং ১১ টি প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। তাই এটা না করে যদি সেন্টার অব একসেলেন্স বলি এর সংখ্যা নির্দিষ্ট না করে দেই, তবে আমার মনে হয় এ বিরোধ সৃষ্টি হবে না। আর কোন প্রতিষ্ঠান জাতীয় অথবা স্থানীয় পর্যায়ে যেখানেই থাকুক, ভাল ভাবে চললেই তাকে সেন্টার অব একসেলেন্স বলা যেতে পারে।

এই খসড়া নীতিতে একটা অতি নিয়ন্ত্রণের প্রবনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, আমার প্রশ্ন হচ্ছে এটা কেন? আমরা কি অপচয় করছি? আমরা কি বেশী লোকদের প্রশিক্ষিত করে ফেলেছি? আর অপচয় যদি হয়ে থাকে তবে জাতীয় অপচয়ের কত অংশ আমরা প্রশিক্ষণের জন্য করেছি। এটার একটা সমীক্ষা হওয়া দরকার। তা'হলে বোধ হয়, এ দর্ভাবনা থাকবে না। আমাদের দেখতে হবে কার প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। কি জন্য প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। আমাদের বর্তমান যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং আগামীতে যা দাঁড়াবে তাতে একমাত্র মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে বাদ দিয়ে সবারই প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। কাজেই অধিক প্রশিক্ষণ দিয়ে দিচ্ছি এ ধারনা ঠিক নয়। আর প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে বলেই পূর্বের সরকারগণ প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। দূতপুল গঠন করেছিলেন। আর এভাবে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনটা অনুভূত হয়েছিল। আজকেও যে সেটার প্রয়োজন আছে, তাকেও অস্বিকার করতে পারবে না। জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে দেখা গেল যে, অনেকেই নিয়ম কানুন জানেন না। তার জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। একেবারে জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে উপজেলা পর্যন্ত প্রতিটি খাত যেমন-গণপ্রতিনিধিগণ, সরকারী কর্মকর্তা, সংস্থার কর্মকর্তা, আধা সরকারী ও বেসরকারী খাত সর্বত্রই প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। কিন্তু প্রশিক্ষণ নীতি মালার মূল বিষয় হবে, এটাকে কিভাবে সুবিন্যাস্ত করা যায় এবং কিভাবে অপচয়, পুনরাবৃত্তি রোধ করা যায়ে। প্রশিক্ষণ নীতিমালার লক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল কি ভাবে তথ্য প্রবাহ পদ্ধতির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গুলোর প্রশিক্ষণের গুনগত মান, বিষয় ইত্যাদি মনিটরিং ও মূল্যায়নের দ্বারা কাঠামোগত করা যায় সেটা দেখা।

কিন্তু বড় সমস্যা হলো সংস্থাপন মন্ত্রালয়কে নিয়ে। কেননা তারা একজনকে এক বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেন কিন্তু অন্য জায়গায় নিয়োগ প্রদান করেন। সরকারী কর্মকমিশনের গঠন সংক্রান্ত ব্যাপারে ও এন্ড এম বিশেষজ্ঞ হাসিউর রহমানকে নিয়ে একই অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমি যখন উনাকে চাইলাম এবং পেলাম ঠিক তখনই তাকে বাণিজ্য মন্ত্রালয়ে বদলী করা হলো। সুতরাং এ ধরণের অপচয় সবচেয়ে বেশী করেন সংস্থাপন মন্ত্রালয়।

বৈদেশিক প্রশিক্ষণের ব্যাপারে বলতে গেলে বলতে হয়, জ্ঞান পাত্রে আছে তুমি সেই পাত্র গ্রহণ কর। হাদিসে আছে - তুমি সুদুর চীন দেশে যাও। আজকের আলোচকদের অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন এবং রেক্টর সাহেব মন্তব্য করতে বলেছেন।

বৈদেশিক প্রশিক্ষণের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি ভংগি কি? তাঁরা কিভাবে এটাকে গ্রহন করেন? বৈদেশিক প্রশিক্ষণের অপব্যবহার সম্পর্কে সন্দেহ কেন? এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশগুলো কি করেছে এ ব্যাপারে? হাঁ, বৈদেশিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে স্পর্শকাতরতা রয়েছে তবে সেটা অবাঞ্ছিত। আমি চাচ্ছি স্বনির্ভর হতে এবং দক্ষতা বাড়ানোর জন্যই বৈদেশিক প্রশিক্ষণ দরকার। কাজেই আমি চাচ্ছি নীতি নির্ধারক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী প্রশিক্ষক এবং শিক্ষাবিধগণকে বাহিরের জগতের সংগে পরিচয় ঘটুক। এ ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা থাকা উচিত নয়। কেননা, যারা যাবেন, তাঁরা অনেক অনেক জায়গা ঘুরে এসেছেন। তাঁরা অনেক দিনের জন্য যাবেন। তারা বাজার করতে যাবেন না। তাই এ ব্যাপারে স্পর্শকাতরতার প্রয়োজন নেই। কাজেই এই নীতিটির সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে। আর তা না হলে, আমরা স্বনির্ভর হতে পারব না।

জ্ঞানের বিভিন্ন বিভিন্ন ক্ষেত্র এবং পরিধি দ্রুত বিকাশলাভ করছে। কিন্তু - প্রশিক্ষণ নীতি-মালায় এ ব্যাপারটার প্রতি দৃষ্টি রেখে অবিচ্ছিন্ন শিক্ষার কথা কিছু বলা হয় নি। এগুলো না জানলে তো চলে না। আসলে আমরা জানি না যে, আমরা কতটা জানি না। এ জানার জন্য যে পরিবেশ দরকার তা নেই বললেই চলে। লাইব্রেরীতে বই পাওয়া যায় না, কিনতে গেলে ব্যয়বহুল। এগুলো আমাদের সমাধান করা দরকার। আর এজন্যই দরকার প্রশিক্ষণের। আমাদের প্রত্যেকের প্রশিক্ষণের দরকার।

আসলে আমাদের তিন প্রকার প্রশিক্ষণ দরকার: একটা হচ্ছে মনের প্রশিক্ষণ, অর্থাৎ মনমানসিকতার প্রশিক্ষণ দরকার। পদ্ধতি, দক্ষতা ও উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ দরকার। আর মধ্য সোপানে দরকার গতিশীলতার প্রশিক্ষণ বা ট্রেনিং অব স্পিরিট। জ্ঞানের ব্যবহারের জন্য এটা দরকার। দেশে অসংখ্য শিক্ষিত ব্যক্তি রয়েছে কিন্তু তাদের জ্ঞানের ভগ্নাংশও প্রয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে না। এটা কাঠামোগত ও পদ্ধতিগত জটিলতা। সরকারের নীতি বিভ্রান্তির জন্যও এটা ঘটে থাকে। আবার ব্যক্তি বর্গের অনাগ্রহের জন্যও এটা ঘটে থাকে। এ পরিবেশে দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্যাবলীর দিকে গুরুত্ব দিলে এ তিনটা দিকের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। প্রশিক্ষণ নীতির লক্ষ্যাবলীও এগুলোর হওয়া দরকার। আপনাদেরকে ধন্যবাদ।

জনাব এম, মজিবুল হক, সভাপতি ঃ

সমাপনী অধিবেশনে আজকের এই সুপারিশমালাতে বিপ্লবী কোন কিছু বলা হয় নি। বরং বিবর্তনবাদী কথা বলা হয়েছে। কেননা বিপ্লবী কথাবার্তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার মধ্যে ব্যবধান বুঝা গেছে। কিন্তু কোথায় যেন একটা নেই ভাব আছে। ভবিষ্যতে আরো আলোচনার অবকাশ আছে। আজকে সবকিছু সম্ভব নয়; সুষ্ঠু চিন্তার অবকাশ আছে।

চারটি দলই বৈদেশিক শিক্ষার কথা বলেছেন। বৈদেশিক শিক্ষা দাতা দেশগলোর ইচ্ছা অনুযায়ী হয়। আর আমরা যা পাই তাই খাই ন আমাদের খেতে হয়। ভারতের অনেক প্রশিক্ষণ বিদেশে হয়। কিনু আমার অনেক মুল্যবান প্রশিক্ষণ দেশে হয়। আর এটা পঞ্চাশের দশক থেকে চলে আসছে। বিদেশের প্রশিক্ষণের সুপারিশমালা বিতর্কের সুচনা করবে। আর বিতর্কের মাধ্যমেই তা গৃহীত হবে। প্রশিক্ষণের মুল প্রতিপাদ্য বিষয় কি হওয়া উচিত? আমরা যে শিক্ষা পাচ্ছি তা নিয়ে বিতর্ক আছে। শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মুল্যবোধ কতটুকু অর্জিত হচেছ তাও দেখা দরকার। প্রযুক্তিবিদদের মানবিক সম্পর্ক বিষয়ে প্রশিক্ষণ কতটুকু হচ্ছে তা দেখা প্রয়োজন। প্রশিক্ষণ কর্মসুচীতে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মুল্যবোধের প্রশিক্ষণ থাকা দরকার। আর তা সকলের জন্যই প্রযোজ্য। প্রশিক্ষণার্থীরা যে স্তরের বা যে জায়গায়ই হোক তাদেরকে মুল্যবোধ প্রধানত ঃ অতীব প্রয়োজনীয় বিশিষ্ট মুল্যবোধ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয়া হচেছ কি না তা দেখা দরকার। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে জ্ঞান ও মুল্যবোধের সৃষ্টি করতে হবে। প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে প্রধান প্রধান মুল্যবোধ গুলো বিস্তার ঘটাতে হবে। মুল্যবোধের শিক্ষা শিক্ষার্থীদের জীবনে শিকড় গেড়ে বসে। যদিও এটা সময়সাপেক্ষ, তবুও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গুলোর ভুমিকা রয়েছে। প্রতিকুল পরিবেশে ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর ভুমিকা প্রশিক্ষণার্থীদেরকে এগলোতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। এ সকল বিষয়ে চিন্তা করা দরকার। প্রশিক্ষণার্থীদের বই পুস্তক বিতরনের চিন্তা ভালো। কিন্তু কোথায় থেকে এগলো দেয়া হবে তা চিন্তা করা দরকার।

প্রশ্ন উঠেছে সামরিক কর্মকর্তাদের বেসামরিক প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ দেয়ার। এটার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। তারা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে আসেন একটি বিশেষ পর্যায়ে। তাঁরা আসতে পারেন। জানতে পারেন। আমরা কি প্রশিক্ষণ দিচ্ছি তা ভাল কিনা? তা জানতে পারেন। সিনিয়র ষ্টাফ কোর্সে তারা আসেন। সামরিক কর্মকর্তারা আসলে আমাদের পদ কমছে তা ঠিক নয়।

ভাল পোষ্টিং কি তা নিয়ে বিতর্ক উঠেছে। ভাল পোষ্টিং কি তা সময়ের বিবর্তনে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্থির হবে। ধন্যবাদ।

অংশগ্রহণকারীবৃন্দের তালিকা

১। জনাব শামসুল আবেদীন,
প্রিন্সিপাল,
ও টি আই।

২। সৈয়দ সায়খল ইমান
উপ-পরিচালক,
বি বি টি এ

৩। জনাব মোঃ আব্দুর রাশেদ,
প্রযুক্তিবিদ
মৎস্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, চাঁদপুর।

৪। জনাব এস,কে জহুরুল ফেরদৌস,
প্রশিক্ষক আর ডি এ।

৫। জনাব আমির হোসেন,
সহযোগী অধ্যাপক,
জি,টি,আই।

৬। জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়া,
প্রযুক্তিবিদ,
মৎস্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,
চাঁদপুর।

৭। জনাব এম,এম,জামান,
পরিচালক,
বাংলাদেশ অডিট এন্ড একাউন্টস,

৮। ডঃ সাদেক উদ্দিন আহমেদ,
পরিচালক,
রেশম গবেষণা ইনস্টিটিউট,
রাজশাহী।

৯। জনাব মোঃ নাজিবুল্লা,
পরিদর্শন ও প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর,
শুল্ক ও আবগারী।

১০। জনাব এ,বি,এ সিদ্দিক,
অধ্যক্ষ,
পোস্টাল একাডেমী
রাজশাহী,
ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়।

১১। জনাব মোঃ মুজিবর রহমান,
পরিচালক,
পরিদর্শন ও প্রশিক্ষণ (কর) পরিদপ্তর,
২য় ১২ তলা ভবন (৬ষ্ঠ তলা)
সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

১২। জনাব এ,কে,এম, ফারুক,
অধ্যক্ষ,
বাংলাদেশ সমবায় কলেজ,
কুমিল্লা।

১৩। জনাব আনয়ারুল হক,
এম,ডি,এস
মিয়ার, ঢাকা।

১৪। ডঃ সালেহ উদ্দিন আহমেদ,
কর্মসূচী সমন্বয় কারী (ব্লাক)
৬৬, মহাখালী

১৫। ডঃ সৈয়দ গিয়াসউদ্দিন আহমেদ,
লোক প্রশাসন বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,

১৬। জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম,
উপ অধ্যক্ষ,
রেলপথ প্রশিক্ষণ একাডেমী,
চট্টগ্রাম।

১৭। শেখ মোস্তফা হোসেন,
পরিচালক,
প্রকৌশল একাডেমী।

১৮। টি,আইএ, খুরশেদ আলম চৌধুরী
অধ্যক্ষ,
এ,টি,আই, তাজহাট, রংপুর।

১৯। জনাব এ,কে,এম, আমিনুল হক,
অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)
মৎস্য প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট,
চাঁদপুর।

২০। এম, হুযরত আলী,
সহযোগী অধ্যাপক,
জি,টি,আই।

২১। জনাব এম, বালাগত উল্যা
পরিচালক
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী,
বাবুপুরা, নীলক্ষেত।

২২। জনাব মোঃ আব তাহের মিয়া,
জাতীয় গণ মাধ্যম ইনস্টিটিউট,
৫৯,ক, সাতমসজিদ রোড, ঢাকা।

২৩। বেগম আয়েশা আজিম,
উপ-পরিচালক,
বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।

২৪। বেগম নাহিদা আমিন খান,
রেক্টর মহোদয়ের একান্ত সচিব,
বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।

২৫। জনাব মোশাররফ হোসাইন,
পরিচালক (প্রশাসন)
বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।

২৬। জনাব স,ক,ম মজনু-নুল-হক,
পরিচালক,
বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।

২৭। জনাব মুঃ আফতাবউদ্দীন খান,
পরিচালক,
বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।

২৮। জনাবা নীলুফার বেগম,
পরিচালক,
পরিকল্পনা একাডেমী

২৯। জনাব হীরালাল বালা
পরিচালক,
বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।

৩০। জনাব মোশারফ হোসেন,
পরিচালক (মূল্যায়ন)
বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।

৩১। ডঃ মতিউর রহমান,
উপ-পরিচালক,
বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।

৩২। জনাব মোজাম্মেল হক,
উপ-পরিচালক,
বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।

৩৩। জনাব সৈয়দ নকীব মুসলিম,
সহকারী পরিচালক,
বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।

৩৪। জনাব মীর ওবায়দুর রহমান,
উপ-পরিচালক
বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।

৩৫। জনাব আশরাফুল মকবুল,
উপ-পরিচালক,
বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।

৩৬। জনাব সৈয়দ শামসুল আলম,
সহকারী পরিচালক,
বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।

-ঃক র্ম সূ চী ঃ-

নিবন্ধীকরণ 08 - 00 হইতে 08-৫৫ ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ঃ

২৬-২-১৩৯৪ বাংলা
১০-৬-৮৭ ইং 09-00 হইতে 09-৪৫ ।

প্রধান অতিথি ঃ এয়ার ভাইস মার্শাল এ,কে, খন্দকার,
মন্ত্রী
পরিকল্পনা মনএণালয়,

চা - বিরতি ঃ

09-৪৫ হইতে ১০ টা ।

১ম কর্ম অধিবেশন ঃ

২৬-২-৯৪ বাংলা
১০-৬-৮৭ ইং । ১০-00 হইতে ১৩-00 ।

বিষয় ঃ- জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতির ধারণাগত কাঠামো ।

সভাপতি ঃ জনাব এ,কে,এম, হেদায়েতুল হক,
রেকটর,
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,
সাভার, ঢাকা ।

প্রবন্ধ লেখক ঃ ১) ডঃ সৈয়দ গিয়াস উদ্দিন আহমেদ,
অধ্যাপক,
লোক প্রশাসন বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,

আলোচকবৃন্দ ঃ ১) ডঃ আকবর আলী খান,
এম,ডি,এস,
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,

২) জনাব এ,এফ,এম, আলমগীর
যুগ্ম প্রধান
পরিকল্পনা কমিশন,।

৩) জনাব আনওয়ারুল ইসলাম,
সম্পাদক,
দৈনিক দেশ ।

৪) ডঃ মিজানুর রহমান শেলী,
চেয়ারম্যান,
সেন্টার ফর ডেভেলপম্যান্ট রিসার্চ ।

৫) সাধারণ আলোচনা

দুপুরের খাবার ঃ
==========
১৩-০০ হইতে ১৪-৩০

২য় কর্ম অধিবেশন

২৬-২-৯৪ বাংলা
১০-৬-৮৭ ইং

দুপুর ১৪ঃ৩০ - ১৭ঃ০০

বিষয় ঃ অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ উন্নয়নের কৌশল ।
==========

সভাপতি ঃ জনাব এ,কে,এম, হেদায়েতুল হক,
রেকটর,
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,
সাভার, ঢাকা ।

প্রবন্ধ লেখক ঃ ডঃ শেখ মাকসুদ আলী,
সদস্য
বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন ।

আলোচকবৃন্দ ঃ ১) জনাব এম,এ, হাই,
সদস্য,
পাবলিক সার্ভিস কমিশন ।

২) ডঃ এম, হারুন-উর-রশিদ,
যুগ্ম সচিব,
শ্রম মন্ত্রণালয়,

৩) জনাব সফিউর রহমান,
যুগ্ম সচিব,
সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়,

৪) ডঃ আলী আহমেদ,
উপদেষ্টা, ইউনেস্কো ।

৫) সাধারণ আলোচনা ।

৩য় কর্ম অধিবেশন ঃ

২৭-২-১৩৯৪ বাংলা
১১-৬-৮৭ ইং

সকাল ৮ঃ৩০ হইতে ১১ঃ০০ ।

বিষয় ঃ জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতিমালা সম্পর্কে কিছু ভাবনা ও সুপারিশ ।
==========

সভাপতি ঃ জনাব এম,এম, আল - হোসাইনী,
চেয়ারম্যান,
পাবলিক সার্ভিস কমিশন ।

উপস্থাপক ঃ ব্রিগেডিয়ার (অবঃ) বি,এস, ইউছুফ হায়দার,
ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব,
ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়,

আলোচকবৃন্দ ঃ ১) ডঃ ফজলুল হাসান ইউসুফ,
মহা-পরিচালক,
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়,

২) ডঃ এ,টি,এম, শামসুল হুদা,
এম,ডি,এস,
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,

৩) জনাব আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী,
পরিচালক,
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া ।

৪) জনাব আমীর হোসেন,
পরিচালক
গ্রাজুয়েট ট্রেণিং ইনস্টিটিউট ।

৫) জনাব এ,এম, শামসুল হক,
যুগ্ম প্রধান,
পরিকল্পনা কমিশন,

৬) সাধারণ আলোচনা ।

৪র্থ কর্ম অধিবেশন ঃ

২৭-২-১৩৯৪ বাংলা

১১-৬-৮৭ ইং

সকাল ১১·৩০ হইতে ১৬·০০

বিষয় ঃ দলগত আলোচনা ও সুপারিশ প্রস্তুতকরণ ।

দুপুরের খাবার (বিরতি) ১৩ঃ০০ হইতে ১৪ঃ০০ ।

৫ম কর্ম অধিবেশন ঃ

২৭-২-১৩৯৪ বাংলা

১১-৬-৮৭ ইংরেজী

১৬ঃ০০ হইতে ১৭ঃ৩০০

সুপারিশ চূড়ান্ত করণ ও উপস্থাপনা ।

সভাপতি ঃ জনাব এম, মুজিবুল হক,
সচিব,
মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ ।